বোধোদয়

শংকর

বোধোদয়

শংকর

পরিবেশক :
প্রকাশক ॥ ৮২/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীমতী মীরা মুখোপাধ্যায়
রায়পুর, বিড়লাপুর,
দক্ষিণ ২৪-পরগণা

মুদ্রক :
সনাতন সাঁতরা
দি সারদা প্রিন্টার্স
১৫, কানাই ধর লেন
কলিকাতা-৭০০০১২

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৬৩
এপ্রিল, ১৯৫৬

অধমের নাম অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়।

মার্কিন মুলুকে এক বেয়াড়া বিমানবন্দরের ডিপারচার লাউঞ্জে ত্রিভঙ্গমুরারি হয়ে বসে আছি। এখন আমার মুখের দিকে তাকালে লোকে একটা শান্ত-শান্ত ভাব লক্ষ্য করবে। কেউ বুঝতে পারবে না আমার ভিতরে কীসব ঘটে গিয়েছে এবং এখনও ঘটছে।

সায়েবী এয়ারপোর্টের সোফাটা বেশ নরম, যুবতী অঙ্গের মতো সুখদায়ক—ওই সোফার ওপরেই বহু-ভ্রমণে ক্লান্ত শরীরটা স্থাপন করেছি। শ্রীঅঙ্গকে ঠিক বাংলা 'দ'-এর মতো দেখাচ্ছে। মেঝে থেকে উঠে সোজা হাঁটুর কাছে একটা ভাঁজ পড়েছে। দ'-এর দ্বিতীয় ভাঁজ পড়েছে ফিমার বোনের কাছে।

অস্থি পেশীর নাম-ঠিকানা আমার জানবার কথা নয়। কিন্তু দেশে থাকতে একবার বাথরুমে পা পিছলে পড়ে বাম অঙ্গের ফিমার বোনের নেকটা ভেঙে ছিল। তা ভোরবেলায় খালি পেটে হাড় ভাঙলুম—আর লোকে বললে কিনা মদের নেশায় পদস্খলন হয়েছিল! মদ আমি একটু-আধটু খেয়ে আনন্দ পেয়ে থাকি, কিন্তু তা বলে ভোর সওয়া-সাতটার মধ্যে কতটুকু হুইস্কি টানা যায় যাতে আক্কেল হারিয়ে পা ভাঙতে পারে? তাছাড়া আমি লেটলতিফ মানুষ। বিশ্বসংসারে এমন কোনো আকর্ষণ নেই যার লোভে আমি সাতটার আগে শয্যাত্যাগ করতে পারি। সকাল-সকাল ওঠা অভ্যাস করাবার জন্যে আমার পিতৃদেব কি কম চেষ্টা করেছিলেন!

এই ম্লেচ্ছ দেশে বসে-বসে খামকা কেন পিতৃদেবের পবিত্র স্মৃতি ধরে টানাটানি করছি! তিনি তো কোন্‌কালে হাড়জুড়িয়ে সাধনোচিতধামে প্রস্থান করেছেন। দেখুন, একটা কথা থেকে কেমন অন্য পাঁচটা কথা এসে

যায়। কোথায় নিজের উরুভঙ্গ আর কোথায় পিতৃদেব শ্রীহারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপদেশাবলী! যা বলছিলাম, সেই ভাঙা ফিমারের মধ্যে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের হাউস সার্জেন মস্ত এক গজাল পুরে দিয়েছিল। এখন সেই মেরামত-করা পায়ে ভর দিয়ে কেমন দুনিয়া চষে বেড়াচ্ছি! কার সাধ্য বলে, এই ভারতীয় ভদ্রলোকের মধ্যে একটা দু' ইঞ্চি লম্বা 'মেড-ইন-আমেরিকা' পেরেক রয়েছে। আসলে এই পেরেকটা এখন 'আমি' হয়ে গিয়েছি। অনির্বাণ চ্যাটার্জি বলতে যে বাষট্টি কিলো বস্তু বোঝায় তারই অচ্ছেদ্য অংশ হয়েছে কয়েক গ্রাম ওজনের এই গজালটা।

এইরকম আরও কয়েকটা অদৃশ্য গজাল আমার মনের মধ্যে গেঁথে রয়েছে। মাঝে-মাঝে যন্ত্রণাও হয়, কিন্তু সেসব কথা কাকে বলি?

এয়ারপোর্ট তো এয়ারপোর্ট। এককালে যখন প্রথম কলকাতার দমদম বিমানবন্দর দেখেছিলাম তখন ট্যারা হয়ে গিয়েছিলাম। এখন সেই মন থাকলে চোখের মণি দুটো স্রেফ কোটর থেকে বেরিয়ে মাইল-খানেক দূরে ছিটকে পড়তো! একখানা শহর জুড়ে যেন একখানা এয়ারপোর্ট। গাড়ি থেকে নেমে, আট গণ্ডা গেট পেরিয়ে, নির্ধারিত এই দক্ষিণদোর খুঁজে বার করতে, আমার অনেক মেহনত হয়েছে।

আমার দু'খানা ব্যাগ বিমান কোম্পানির কাউন্টারে জমা দিয়েছি। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ এয়ারলাইনের ছুঁড়িটাও বেশ অভিজ্ঞা মনে হলো! আমার মাল নির্ধারিত কুড়ি কিলোগ্রামের একটু বেশী হয়েছে বলে বাড়তি ভাড়ার কথা তুলতে যাচ্ছিল। আমি শ্রীমতীর রঙকরা চোখের দিকে আমার চোখের তীর ছাড়লাম। যুবতী সুরসিকা। মুচকি হেসে প্রত্যুত্তর দিলে। দেখলাম, বুকের কাছে সাদা জামাটার ওপর সেফটিপিন দিয়ে নাম আটকানো—এলিজাবেথ।

মার্কিনতনয়াকে জানালাম, "হে সুন্দরী, পরীরাও তোমার নখের যোগ্য নয়।"

প্রশংসায় মন কার না গলে? খুব খুশী হয়ে ছুঁড়ি আমার দিকে একটা ইংরেজী ধন্যবাদ দিলে। বাড়তি ভাড়ার কথা তুললোই না। বরং আমার দিকে এমনভাবে তাকালো সে কি বলবো! ভাগ্যে কাছাকাছি কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছেলে-ছোকরা ছিল না। থাকলে, ছুঁড়ির ভাবভঙ্গী দেখে তাদের বুক জ্বলে যেতো। কিন্তু আমার সোজাসুজি কথা—বুক জ্বললে অম্বলের ওষুধ খাও। এই যে ভ্রূধনু ভঙ্গ করে সুন্দরীর উদ্দেশে শর নিক্ষেপ করলাম, তার মধ্যে মিনতি ছাড়াও বালিকা বশীকরণের ক্লোরোফরম মেশানো ছিল। অনেক সাধ্যসাধনা করে, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এই বিদ্যেটি আমাকে রপ্ত করতে হয়েছে।

বিড়ালাক্ষী এবার ঘস ঘস করে বোর্ডিং কার্ড লিখে ফেললো। লাগেজের টিকিট দুটো আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে ফিক করে হাসলো। আমাকেও চোখের মণি নাচিয়ে প্রত্যুত্তর দিতে হলো। কুড়ি কিলোর শাসন যতদিন আকাশপথের যাত্রীদের সহ্য করতে হবে ততদিন দেঁতো হাসি না বিলিয়ে উপায় কী?

বিমান কোম্পানির হাতব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে অবশেষে আমি ডিপারচার লাউঞ্জে এসে বসেছি। আমার টিকিটের ফ্লাইট নম্বরটার সঙ্গে গেটের সামনে লেখা নম্বরটা মিলছে কিনা দেখে নিলাম। ঘড়িতে দেখলাম এখনও বেশ সময় আছে।

বিমানবন্দরের আয়োজনটা এলাহী—প্রতি মিনিটে এখান থেকে নাকি একখানা প্লেন উঠছে না হয় নামছে। ব্যাপারটা বুঝুন! আকাশেও ট্রাফিক জ্যাম—যেমন জ্যাম কলকাতার রাস্তায় প্রায়ই হচ্ছে, কাগজে দেখে থাকি। কিন্তু এতো লোক এতোগুলো প্লেনে কোথায় যাচ্ছে বা কোথা থেকে আসছে ভাবলে মাথার ঠিক থাকে না। কী এতো কাজ বলুন তো প্রত্যেকটা লোকের? আলাদা আলাদা ভাবে এদের মুখগুলো খুঁটিয়ে দেখুন। কেমন হন্তদন্ত ভাব, যেন ওঁর এই প্লেনে যাওয়া-না-যাওয়ার ওপরেই বিশ্বসংসারের ভবিষ্যৎ

নির্ভর করছে।

মেজাজটা ভাল নেই—তাই সময় সম্বন্ধে হিসেবী না হয়ে নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই এয়ারপোর্টে হাজির হয়েছি। আর এসে যখন পড়েছি তখন দু'চোখ খুলে কাছাকাছি যেসব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রয়েছে তা নিরীক্ষণ করে চক্ষু নামক ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি করা যাক। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বলতে আমি অবলা অবলোকন বুঝে থাকি। এতে চরিত্রবানদের বিরক্ত হবার কিছু নেই। পুলিসে খবর দিয়েও কেউ কিছু করতে পারবেন না। মেয়েদের দিকে তাকানোটা কোনো দেশে (এমন কি ইণ্ডিয়াতেও!) বেআইনী নয়। বহু মেহনত করে ভগবান যেসব সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন, মানুষ তা না দেখলে শিল্পী হিসেবে তাঁর আফসোসের শেষ থাকবে না।

আমার দেহটাকে নরম সোফায় এলিয়ে দিয়ে, সামনের টেবিলে এক পেগ হুইস্কি স্থাপন করেছি। খাঁটি স্কচ এই হুইস্কির বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনের কোনো মানে হয় না। আমেরিকানরা অনেক চেষ্টা করে হাড়ে-হাড়ে বুঝেছে স্কটল্যাণ্ড ছাড়া কোথাও হুইস্কি হয় না—যার কর্ম তার সাজে। ব্যাপারটা বুঝুন। মাওভক্ত চীনে, লেনিনভক্ত রুশ, ডলারভক্ত শামচাচা, গান্ধীভক্ত ইণ্ডিয়ান, জিন্নাভক্ত পাকিস্তানী, রপ্তানীভক্ত জাপানী, বিপ্লবভক্ত কিউবান সকলেই পৃথিবীতে একটি ব্যাপারে একমত—স্কচ জিনিসটা স্কটল্যাণ্ডেরই সাজে। এই একটিমাত্র সংগঠনমূলক প্রস্তাব জাতিসঙ্ঘে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হতে পারে। আমি যেদেশে ফিরছি সেদেশে চোরজোচ্চোর, বিদেশী কূটনীতিকদের ল্যাংবোট, কিছু কোম্পানিকর্মী ও তাঁদের অনুগৃহীত বন্ধু ছাড়া আর কারুর পক্ষে স্কচ সেবন প্রায় স্বপ্নের ব্যাপার! এখন তাই দ্রুতবেগে স্কচের গুষ্টির নিকুচি করছি। অথচ বহু ছোঁড়াকে হাতে-খড়ি দেবার সময় বার বার পাখি-পড়া করিয়েছি—বীয়ার ঢক-ঢক করে খাবে, আনন্দটা গলায়

পাওয়া যায়; আর স্কচ চুক চুক করে খাবে, স্কচের মজা জিভের ডগায়। জিভ গো জিভ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অন্যতম ইন্দ্রিয় জিহ্বা!

দূর ছাই, ইন্দ্রিয়ের কথা কেন তুললাম। আবার আমার বাবার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। তিনি বলতেন, পঞ্চেন্দ্রিয়কে সর্বদা শাসনে রাখতে হবে। যারা ইন্দ্রিয়ের দাস তারা পৃথিবীর কোনো উপকারে লাগবে না।

আর মনে পড়ছে বোধোদয়ের কথা—পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত বিদ্যাসাগরের সহি ও বিদ্যাসাগরবাটী অঙ্কিত খোদ রিসিভার-এর সংস্করণ বোধোদয়, যার কোথাও একফোঁটা ভেজাল নেই। লাল রঙের মলাট বইটার, পাঁজির কাগজে ছাপা, আর যতসব গোলমেলে উপদেশে ভরতি। এই ইন্দ্রিয় কথাটা কেমন একটু অশ্লীল মনে হয়। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর, শৈশবকালে এই শর্মাকে আপনি তো যথেষ্ট জ্বালিয়েছেন! এখন ভারতবর্ষ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে বিদেশী এয়ারপোর্টে বসে যখন নিরামিষভাবে দু'একটি বক্ষবতী বালিকা-নিরীক্ষণ করছি, সেই সময় এই নির্বোধের মনের মধ্যে উপস্থিত হয়ে তার বোধোদয়ের চেষ্টা করছেন কেন? এতে কোনো লাভ হবে না, মাঝখান থেকে শুধু রসভঙ্গ হচ্ছে।

বিদ্যাসাগরের নীতিমালা ডোন্ট-কেয়ার করে আমি সামনের টেবিলের যুবতী মেয়েটিকে দেখছি। আমার দৃষ্টি শ্রীমতীর চুল চোখ নাক কান ঠোঁট ঘাড় এবং হাত থেকে হড়কে এবার স্বাস্থ্য-দুটিতে নিবদ্ধ হয়েছে। নিটোল স্বাস্থ্য। এবার অবরোহণ! আহা, হাঁটু থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত দেখবার জিনিস! পাতলা নাইলনের হোস্ পরে মেয়েটা ভগবানের দেওয়া পা দুটোর বারটা বাজায়নি। নিম্নাঙ্গের কাপড়-চোপড় সম্পর্কে এই অধমের সুচিন্তিত মতামত আছে। আমার বক্তব্য, যখন স্কার্টের ঝুল ছোট হতে হতে হাঁটুর ওপরে উঠেছে, তখন ওই কিমার নেক পর্যন্ত নাইলনের বোরখা পরার যুক্তি নেই। কতবার

তো আর্টের লোকরা, আদালতের জজরা, পণ্ডিতরা, মুনিঋষিরা ঘোষণা করেছেন, কোনো জিনিস থাকলেই অশ্লীল হয় না, অশ্লীল হয় নিষিদ্ধবস্তু অযথা ঘাঁটাঘাঁটি করলে, কিংবা এই ক্ষেত্রে ন্যাকামো করে শাক দিয়ে মাছ ঢাকলে। এই যুবতীর পায়ের আকার চমৎকার, নরম শাদা পাথর থেকে যেন অতি যত্নে কেটে বার করা হয়েছে। শাড়ির জয়গানে পশ্চিমী মূর্খরা যতই মুখর হোন, রসিকজনরা জানেন স্কার্টের তুলনা নেই।

আমি শ্রীমতীর পায়ের ডিম দুটোর দিকে নজর রেখেছি। মহিলার সমস্ত আত্মবিশ্বাসের কেন্দ্রস্থল যেন ওই দুটি মাংসের টেনিস বল। কিন্তু ভাল করে দেখা হলো না। কেমন করে হবে? মহিলা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন এবং বারের দিকে যাচ্ছেন।

আ মলো যা! কোথায় দেশত্যাগী হবার আগে একটা 'শক্ত' পানীয় নিবি—তা নয় কফি। তাও দুধ এবং চিনি ছাড়া। ভাগ্যে ভগবান আমাকে আমেরিকান মেয়ে করেননি, তাই খাওয়ার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হইনি। বাথরুমে ওজন হবার যন্ত্রটা প্রত্যেকটি স্বাস্থ্যবতী মার্কিন মহিলার দিকে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে রয়েছে। আর দর্জির ফিতেটা যেন একটা সাপ। বক্ষ-কটি-নিতম্ব ইত্যাদি ইত্যাদির ব্যালান্স সামান্য নষ্ট হলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে। এদেশে এতো খাবার কিন্তু প্রাণ ধরে মুখে তোলবার উপায় নেই।

দূর থেকে যেন ইন্দ্রাণী সেনকে দেখতে পাচ্ছি। উনিও তাহলে আমাদের সহযাত্রী হবেন। ওই ওজনের ব্যাপারে ইন্দ্রাণীর কথাই ধরুন না কেন? ওকে তো বলেছিলাম, "এখানকার এক গেলাশ দুধ মানে এক গেলাশ দুধ! মনে রাখবেন এটা ইণ্ডিয়া নয়।"

ফিক করে হেসেছিল ইন্দ্রাণী। বলেছিল, "আমি ইণ্ডিয়ার মেয়ে—আমি ডেট করতে আসিনি এখানে। ফিগার নিয়ে কী করবো? আমার কর্তার জন্য বড্ড মন কেমন করছে।"

বিরহিণীকে বুদ্ধি দিয়েছিলাম, "লিখুন না, রোজ বিরাট-বিরাট চিঠি। দেশে ফিরে গিয়ে সাড়ে আটশ পাতার পত্র-সাহিত্য প্রকাশ করবেন। দেবেন আমাকে প্রকাশনা স্বত্ব। 'স্ত্রীর একান্ত পত্র' এই নামে বার করবো—ছ'মাসে ন'টা সংস্করণ হয়ে যাবে।"

"আপনি ভারি অসভ্য। আমেরিকায় থেকে থেকে একেবারে রেড ইণ্ডিয়ান হয়ে যাচ্ছেন।" হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়েছিল ক্ষণকটা ইন্দ্রাণী সেন।

সেই ইন্দ্রাণী সেন আমার চোখের সামনে মোটা হতে আরম্ভ করলো। প্রথমে ওর মুখে যেসব খানাখন্দ ছিল তা ভরে গেলো। গাল দুটো কেমন ভারি ভারি হয়ে উঠলো, ব্লাউজগুলো অল্টার করেও আর মানাচ্ছে না, গায়ে সেঁটে ধরেছে। নেহাত শাড়ি পরে তাই; না হলে অনেক খরচের ধাক্কায় পড়তে হতো ইন্দ্রাণীকে। প্রত্যেক মাসে অতগুলো করে ডলার জমানো বেরিয়ে যেতো।

এক মার্কিন বন্ধু বলেছিল, "ইণ্ডিয়ান স্বামীরা খুবই ভাগ্যবান—বৌ হাতি হয়ে গেলেও শাড়ির সাইজ পাল্টায় না। আমার বৌ-এর ভাইট্যাল স্ট্যাটিসটিকস এক ইঞ্চি পাল্টালো গত বছরে—বাইশখানা ফ্রক একেবারে বরবাদ হয়ে গেলো।" সেই জন্যেই এই দেশে সবাই যৌবনের সঙ্গে স্থিতাবস্থা চুক্তি করতে চায়। যেমন এসেছো ঠিক তেমন থেকে যাও, একেবারে বডি-সাইজের মৌরুসী পাট্টায় সই লাগাও।

ইন্দ্রাণী এখন অন্য কারুর সঙ্গে কথা বলছে। ওরা বোধ হয় ইন্দ্রাণীকে তুলে দিতে এসেছে। আমি বরং ততক্ষণ আর এক পেগ হুইস্কি নিই। পকেটে অনেকগুলো খুচরো ডলার রয়েছে। ডলারের দেশেই খুচরো ডলারকে ফেলে যাওয়া ভাল।

হুইস্কি নিয়ে এসেছি আবার। একটু পরেই মহাশূন্যে সুন্দরীরা মদিরা পরিবেশন করবেন। অনেক দাম কম। ফার্স্টক্লাসে গেলে তো

পয়সাই লাগতো না। ডিউটি-ফ্রি দোকানে জলের দামে দুনিয়ার সেরা পানীয় বিক্রি হচ্ছে। ইণ্ডিয়াতে একখানা বোতল ঝুলিয়ে ঢুকলে কাস্টমস কিছুই করতে পারবে না। মাথা বটে ইণ্ডিয়ানদের—যেমন আইন তেমন ফাঁক। যেহেতু লেখা আছে এক বোতল ফ্রি, আমাদের খৈতানজী সেবার প্রায়-মানুষ-সমান এক হুইস্কির বোতল কিনে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। শুনেছি, খৈতানজীর এই কাণ্ডর পরেই আইন আরও টাইট হয়েছে, বোতলের সঙ্গে বোতলের মাপও বেঁধে দেওয়া হয়েছে। বেশ চলেছে এই লুকোচুরি। আইন যত টাইট হয়, লোকেরা তত ফাঁক বার করে ; আইন তখন আরও টাইট হয়, আরও ফাঁক বেরোয় !

নাঃ, এইসব বাজে কথা ভাবতে গিয়ে, সামনের মেয়েটা যে কখন উঠে দাঁড়িয়েছে খেয়াল করিনি। টাইট স্কার্ট পরে মেয়েরা যখন হাঁটে, তখন দূর থেকে দেখতে আমার খুব ভাল লাগে। আমি কেন, বহু শর্মারই বুকের ভিতর খুশী-খুশী ভাব জাগে, কিন্তু মুখে তাঁরা স্বীকার করবেন না। বাজারে তাঁরা চরিত্রবান বলে পরিচিত। মিনি স্কার্ট দেখলে তাঁদের নাকি গা ঘুলিয়ে ওঠে! মনের ভিতরে ডাস্টবিন, বাইরে হরিনাম।

একটু দূরে গিয়ে মেয়েটা একজন মার্কিন মিলিটারি ছোকরার বাহুলগ্না হয়েছে। ছোকরা বেজায় লম্বা—ঝুঁকে পড়ে বেঁটে মেয়েকে চুমু খেতে হচ্ছে। মরে যাই, মরে যাই! এদের এই দিনদুপুরে হাটের মধ্যে রাসলীলা দেখলে আমার বাবা হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী মশায়ের কী অবস্থা হতো ভাবছি। আমার বাবাকে বিশ্বাস নেই—এই মুহূর্তে তাঁর আত্মা এখানে চলে আসতে পারেন ছেলের চরিত্র রক্ষা করবার জন্যে। হয়তো কানে কানে বলে বসবেন, "খোকা, চোখ ফেরাও। এতো জিনিস থাকতে ওইদিকে তাকিয়ে আছো কেন?"

এদের বিরহ বেশ সুদীর্ঘ হবে! চুম্বনের দৈর্ঘ্য থেকেই সেটা আন্দাজ করছি। আরে লম্বু, তোর যে ঘাড় বেঁকে যাবে, ওকে একটা চেয়ারের

ওপর দাঁড় করিয়ে দে-না। এ তো আর ইণ্ডিয়া নয় যে লোকের ভিড় জমে যাবে, পুলিস থানায় চালান করে দেবে।

নাঃ, এরা বাড়াবাড়ি করছে। আর আদিখ্যেতা কোরো না বাছাধন। জাপানে গিয়ে কী করবে সে তো জানাই আছে! হিসেব-পত্তর অত বুঝি না, কিন্তু তোমাদের নোবেল প্রাইজ-পাওয়া লেখিকা পার্ল বাকই তো কাগজে বলেছেন, প্রতি দশজন মার্কিন সৈন্যপিছু একটি জারজ সন্তান এশিয় ভূখণ্ডে পড়ে থাকছে। এই জারজরাই তো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সাঁকোর কাজ করবে! লেকচার দিয়ে সাংস্কৃতিক সংহতি হয় না। ইতিহাসের দিকে চেয়ে দেখো, এক সভ্যতার সঙ্গে আর-এক সভ্যতার সবচেয়ে শক্ত গাঁটছড়া পড়েছে বিছানায়! বিছানাই হচ্ছে সর্বতীর্থসার।

ক্লোজড্ সার্কিট টেলিভিশনের পর্দাটা ঝকমক করছে। ওইখানেই লেখা ভেসে উঠলো—ফ্লাইট ওয়ান-ও-ওয়ানের যাত্রীরা ইচ্ছে করলে এবার এমিগ্রেশন কাউন্টারে যেতে পারেন। এদেশে ঢোকবার সময় কত কাণ্ড! বুকের ছবি দেখাও, রক্তের রিপোর্ট জমা দাও, পাসপোর্ট বার করো, ভিসা ঠিক আছে তো? কিন্তু কী হলো বাবা! এতো ছবিটবি তুলিয়ে কিছু ধরতে পারলে না। আমার মনের ভিতরের কোনো কিছুই খোঁজ করতে পারলে না। আমার বাবা, গর্ভধারিণী মা কেউ আমাকে বুঝতে পারলো না, তোমরা তো ছেলেমানুষ।

আমার পকেটের পাসপোর্টটা বার করে একবার হাত বুলিয়ে নিলাম। একটা নয়, তিন-তিনটে সিংহ মলাটের ওপর থেকে আমার দিকে জ্বলজ্বল করে তাকিয়ে আছে। আগে যখন মহানুভব ইংরেজ সরকার রাজত্ব করতেন, তখন একখানা সিংহ নাকি আমাদের ওপর বড্ড উপদ্রব করতো। এই সিংহ তাড়াবার জন্যে কত লোক ফাঁসিতে চড়ল, গুলি খেল, জেলে পচে মরল। হিস্ট্রিতে কত লোকের নাম উঠে গেল,

কত অভাগিনী বিধবা হলো, কত মায়ের চোখের জল এখনও শুকোল না। একটা সিংহ তাড়িয়ে এবার তিনটে ভাল সিংহ পেয়েছি আমরা।

আর পাসপোর্টের একটা পাতায় ঈগল পাখীর রবার-স্ট্যাম্প আছে। ভিসায় এই ছাপ না থাকলে এরা আমাকে এ-দেশে ঢুকতেই দিত না। রাজবল্লভ সাহা সেকেণ্ড বাই লেন-এর অনির্বাণ চাটুজ্যের জীবনে মার্কিন সরকারের ওই রবার-স্ট্যাম্পটা বড্ড প্রয়োজনীয় ছিল। এর জন্যেই তো কত সাধ্যসাধনা, কত মাথা ঠোকাঠুকি। এই যে আমাকে চলে যেতে হচ্ছে, তাও ওই রবার-স্ট্যাম্পের জন্যে। যদি ওখানে আরও বেশীদিনের মেয়াদ থাকতো, কিংবা বেণীমাধব রায় যদি আমাকে রক্ষা করতে পারতেন, তাহলে অনির্বাণ চাটুজ্যেকে আপনারা আজকে এয়ারপোর্টে বসে থাকতে দেখতেন না।

এ-সব কথা প্লেনে বসে ভাবা যাবে। মেজাজটা ভাল নেই বলেই সব কথা গুছিয়ে ঠিকমতো ভাবতে পারছি না। মনে করবেন না এটা হুইস্কির ফল। দু' পেগ পেটে পড়লেই যারা হ্যাতাজোবড়া হয়ে যায়, অনির্বাণ চাটুজ্যে তাদের দলের নয়।

এখন সামনে এগোনো যাক। ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে কাস্টমস-এর ঝামেলা সামলাই।

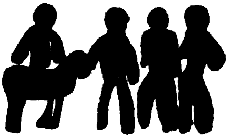
টুপি-পরা কাস্টমস-এর লোকগুলোকে দেখলে আমার মিশ্র অনুভূতি হয়। কখনও ইচ্ছে হয় টুপিটা খুলে নিয়ে মাথায় গাঁট্টা লাগাই, কখনও মনে হয় ধরে আদর করি, চুমু খাই। এই যে লোকটা মিষ্টি হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করলে আমায়, ওর বিরাট গোঁফ রয়েছে তাই, না হলে থ্যাংকু বলবার সময় চুমু খেয়ে দিতাম। যখন ঢুকেছিলাম তখন তোমাদের ডাক্তারকে বুকের ছবি দেখাতে হয়েছিল। এখন ফেরত পাঠাবার সময় বুকের ছবি দেখলে না কেন? দেখা নিশ্চয় উচিত ছিল তোমাদের—বুকটা যে ঝাঁজরা হয়ে গিয়েছে এখানে। বেশ বাবা, বুক ঝাঁজরা করে এখানে আসতে পারবে না—কিন্তু আমার ভাল বুক যদি এখানে ঝাঁজরা

হয়ে গিয়ে থাকে তার জন্যে তোমাদের কোনো দায়িত্ব নেই ?

কাস্টমসের লোকটা জিজ্ঞেস করলে, "খুব ভ্যালুয়েবল কিছু আছে নাকি, ডিক্লেয়ার করবার মতো ?"

আসবার সময়ও এই প্রশ্ন ক'রেছিল। অনেকদিন আগে অস্কার ওয়াইল্ডকেও ওরা এই প্রশ্ন করেছিল। সাহিত্যিক মানুষ, দিয়েছিল শামচাচার থোঁতা মুখ ভোঁতা করে—'নাথিং টু ডিক্লেয়ার এক্সেপট্ মাই ট্যালেণ্ট।' বাজারে আমার অস্কার ওয়াইল্ডের মতো নাম নেই—কিন্তু ভেবো না আমার ট্যালেণ্ট কম আছে! আর তাছাড়া এবারে তোমাদের এখান থেকে যা নিয়ে যাচ্ছি—তা তোমরা ইলেকট্রনিক মেসিন দিয়ে সার্চ করলেও খুঁজে পাবে না। যাদুকর পি. সি. সরকারের মতো আমি খোলাখুলি বলে দিচ্ছি আমি কী নিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু ধরতে পারবে না। অভিজ্ঞতা, মাই ডিয়ার স্যর, অভিজ্ঞতা। কিন্তু মুখের দিকে তাকাও—কেমন কচি খোকার মতো নিষ্পাপ মুখ। এই চাঁদমুখটাই তো আমাকে বাঁচিয়ে যাচ্ছে। যে গর্দভ লিখেছিল, মুখটা মনের আয়না, সে হাওড়া রাজবল্লভ সাহা সেকেণ্ড বাই লেনের অনির্বাণ চাটুজ্যেকে দেখেনি।

এমিগ্রেশন কাউণ্টারের লোকটা ভিসার ছাপটার ওপর আর একটা ছাপ মারবার আগে মুখের দিকে তাকালো। সোনার চাঁদ, আমার দিকে অমনভাবে তাকাচ্ছ কেন? দেখতেই তো পাচ্ছ, আজই তোমাদের দেশে আমার শেষ রজনী। আজ বারোটার পরে এখানে থাকলে তোমরা হাঙ্গামা হুজ্জুৎ করবে, হয়তো ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে ঠেলবে, না হয় সরকারী খরচায় জোর করে প্লেনের সীটে বসিয়ে দেবে।



এবার একটু শান্তিতে বসেছি আমি। এখন আমি না ঘরকা, না ঘাটকা। ওই যে রেলিংগুলো দেখা যাচ্ছে, তারই পিছনে আমি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকাকে ফেলে রেখে এসেছি। পাসপোর্টে রবার-স্ট্যাম্প পড়ে গিয়েছে, ওখানে আমার আর ঢোকবার উপায় নেই। আর সামনে—মানে দূরে, বহু দূরে, পাহাড় পর্বত পেরিয়ে, নদী, সমুদ্র, মহাসমুদ্রের ওপারে—রয়েছে আর এক দেশ, যার তিনটে সিংহকে আমি পকেটে পুরে রেখে দিয়েছি, যার নাম ভারতবর্ষ। কিন্তু সে-দেশ সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র আগ্রহ নেই।

এটা নিতান্তই একটা অ্যাক্সিডেন্ট। অনির্বাণ চ্যাটার্জী রাজবল্লভ সাহা সেকেণ্ড বাই লেনে না জন্মে, পৃথিবীর অন্য যে-কোথাও জন্মাতে পারতো। ম্যাপের দিকে তাকিয়ে দেখুন না, পৃথিবীতে আরও কত দেশ রয়েছে। আমার জন্মদিনে পৃথিবীতে আমার মা ছাড়াও তো কত মহিলার লেবার পেন উঠেছিল। তারই কোনো একটা থেকে যদি আমি বেরিয়ে আসতাম, তাহলে হয়তো আমার নাম হতো হুং ফ্যাং, কিংবা আকিতো তাকাদি, কিংবা জন মার্কস, কিংবা গুর্গেণফ, কিংবা আরিস্তাই-দিস, কিংবা জন নাক্সারো, বা অন্য কিছু। কিন্তু তাতে আমার কিছুই এসে যেতো না—শুধু আমার পাসপোর্টের রঙ আলাদা হতো।

এখন যা পাসপোর্ট পেয়েছি সেইটাই একটু পড়ে দেখা যাক। বেশ মজা লাগছে। আমার মেষ রাশি! অর্থাৎ একটা ভেড়ার পকেটে তিনটে সিংহ ঢুকে গিয়েছে।

বইটা বার করে এই প্রথম মন দিয়ে পড়তে লাগলাম। এখন

নিজেকে বিরাট একটা গাঁট্টা লাগাতে ইচ্ছে করছে। কেন পাসপোর্টটা আগে খুঁটিয়ে দেখিনি। ভারত গণরাজ্যকে রাষ্ট্রপতিকে নামপর আশা-প্রকাশ করা হয়েছে যে, এই পাসের বাহক অনির্বাণ চ্যাটার্জিকে 'বিনা রোক-টোক, আজাদীসে আনে জানে দেঁ, ঔর উসে হর তরহ কী সহায়তা ঔর সুরক্ষা প্রদান করেঁ জিসকো উসে আবশ্যকতা হো।

নিজের আঙুল নিজেই কামড়াচ্ছি। সারাজীবন ধরে এই তো চেয়েছি আমি। বাবার উচিত ছিল জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার একটা পাসপোর্ট করিয়ে রাখা। বিনা বাধায় যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ানো, আর ঘুরতে ফিরতে গিয়ে কোনো গোলমাল বাধিয়ে বসলে পাবো 'সহায়তা ও সুরক্ষা'। এখন ভাবছি প্রফেসর নিমাই মুখার্জির কথা। নিমাই কী বলেছিল জানেন?

আমাকে নিজের ফ্ল্যাটে, সোফায় বসিয়ে হাতে এক কাপ কফি ধরিয়ে দিয়ে নিমাই মুখুজ্যে জ্ঞান দিয়েছিল, "মিস্টার চ্যাটার্জি, সংসারে আমরা সবাই যে যার কর্মের জন্যে ফল ভোগ করবো। কেউ আমাদের সাহায্য করবে না, রক্ষে করবে না।"

তখন নতুন এসেছি। নিউটন ইউনিভার্সিটির ফিজিওলজির অধ্যাপক নিমাই মুখুজ্যের বাইরের আচরণ দেখে মোহিত। ভাবলাম, যা-যা বলছেন মন দিয়ে শুনি। তখনও নিমাই মুখুজ্যেকে চিনিনি আমি।

একি! নিমাই মুখুজ্যেকে দেখছি না? হ্যাঁ, তাই তো। ওঁর ঘাড়েও তো দেখছি এরোপ্লেন কোম্পানির ব্যাগ। নিমাই মুখুজ্যেও তাহলে ফিরছেন আজ। আরে, টুলটুলকে (মিস তিলোত্তমা মিত্র) দেখছি এখানে। কী ব্যাপার! তাই তো, এখন নিউটন বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীষ্মের ছুটি পড়ে গেল। ক্যাম্পাস খালি হয়ে যাবে এইবার।

আমি এখন একটা বই-এর মধ্যে মুখ গুঁজে থাকি। আকাশচারী হবার আগে নিমাই মুখুজ্যের সঙ্গে কথা বলে মেজাজটা নষ্ট করতে চাই না। এইসব লোকের সান্নিধ্য অনেকক্ষণ সহ্য করতে হবে। বোয়িং

৭০৭ যতই চেষ্টা করুক, ঘণ্টায় ৬৫০ মাইলের বেশী তো ছুটতে পারবে না। হে ঈশ্বর, শক্তি দাও।

"মাস্টারমশায়!" আমি চমকে উঠলাম।

আমি যতই পাষণ্ড হই, মাস্টারমশায় নামটা এখনও আমার মনকে নাড়া দেয়। আমি মাস্টারও নই, মহাশয়ও নই! আমাকে তো একজন ছাড়া কেউ ওই নামে ডাকে না!

চোখ মেলে তাকালাম। হ্যাঁ। যাকে এই মুহূর্তে একটুও দেখবার প্রত্যাশা ছিল না, সেই। ছোকরা আমার দিকে ছেলেমানুষের মতো তাকিয়ে আছে। আর আমিও ওর শরীরটা দেখছি। মায়ারউড ফরেস্টে পিকনিক করতে গিয়ে একবার কয়েকটা রেডউড গাছ দেখেছিলাম—যেন পৃথিবীর মাটিতে পা রেখে তারা আকাশকে ধরে ফেলবার জন্যেই জন্মেছে। এতো বিরাট তবু কোনো দম্ভ নেই। আমাদের এই ছেলেটিও সেই রকম। ওর উচ্চতা দেখুন, এই লম্বা মানুষের দেশেও কেমন সাধারণের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে।

"মাস্টারমশায়, আমি কুমার। হোয়াট এ প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ," কুমারের অনভ্যস্ত বাংলা আটকে যায়। আটকাবে না, বেচারা বাংলায় কথা বলার সুযোগ জন্ম থেকে কতটুকু পেয়েছে?

"হাই! হাউ নাইস টু সী ইউ।" আমি কি রকম হুড় হুড় করে মার্কিনী ইংরিজী বলে গেলাম। আমার ইংরিজীটা নাক দিয়েই বেরুলো, এদেশের কুড়ি কোটি লোকের ইংরিজী যেখান থেকে বেরিয়ে থাকে। খোদ ইংরেজদের তার জন্যে কী মনঃকষ্ট!

কথাগুলো কায়দামাফিক বলে গেলেও আমি সামান্য বিব্রত বোধ করছি। আমার বিব্রতবোধ করার কারণ আছে। আমার মতো সৌজনড্ কাঠও কুমারের সরল নিষ্পাপ দৃষ্টির উত্তাপে একটু একটু বেঁকতে আরম্ভ করছে।

বলে রাখি, কুমারের দেহে ভারতীয় ও আমেরিকান রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। কুমার কি জানে, কেন আমাকে মার্কিন দেশ ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে ?

কুমার বললে, "মাস্টারমশায়, আপনি আমাদের বাড়িতে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন কেন ?"

আমি অভিনয় করলাম, "একদম সময় পাচ্ছিলাম না। শেষ দিকটা খুবই ব্যস্ত থাকতে হতো।"

"আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করে থাকতাম। বাবাকে জিজ্ঞেস করেছি, তিনিও বললেন, বোধ হয় আপনি থীসিস লেখায় ব্যস্ত আছেন।"

বাবা, অর্থাৎ অধ্যাপক বেণীমাধব রায় ডি-এস-সি। সত্যি বলছি, আমি যদি জানতাম কুমার এই প্লেনে যাবে, তা হলে আমি অন্য কোনো ফ্লাইট নিতাম।

"মাস্টারমশায়!"

"বলো।"

"আপনাকে খুব গম্ভীর দেখাচ্ছে কেন ?"

"কোনো দেশে অনেক দিন থাকার পর ছেড়ে যাবার সময় এমন হয়।"

কুমার বললে, "আমি ইণ্ডিয়াতে যাচ্ছি।"

সর্বনাশ! বেণীমাধব ও তাঁর স্ত্রী আইলীনও নিশ্চয় এয়ারপোর্টে এসেছেন তাহলে।

"বাবা-মা'র সঙ্গে আসবার আগে নিশ্চয় দেখা হয়েছে, অনেক কথা হয়েছে," কুমার জিজ্ঞেস করলে।

আমি মিথ্যে বললাম, "হ্যাঁ, সে তো বটেই।" আমি কিন্তু আসবার আগে ওঁদের সঙ্গে দেখা করিনি। বেণীমাধবকে এতোদিনে আমি অন্তত চিনেছি, কেন তাঁকে যন্ত্রণা দেবো।

কুমার এবার আরও কথা বললে। "মাস্টারমশায়, আমরা আপনাকে লাউঞ্জে দেখতে পেয়েছিলাম। মা ও আমি আসছিলাম আপনার দিকে। বাবা বারণ করলেন। জানেন তো কেমন গম্ভীর মানুষ। শুধু বললেন, 'ও গভীর চিন্তায় ডুবে রয়েছে, ওকে বিরক্ত কোরো না, ওকে একা থাকতে দাও।' তারপর আমরা রেস্তোরাঁয় গিয়েছিলাম।"

কুমারের কথা শুনে যাচ্ছি। সে বললে, "মাস্টারমশায়, আমরা যখন কফি শপ থেকে বেরিয়ে এলাম, তখন আপনি কাস্টমস এনক্লোজারে ঢুকে গিয়েছেন।

"বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাকে কিছু বলতে হবে কিনা। বাবা কেমন গম্ভীর মানুষ জানেনই তো। শুধু বললেন, ওকে আমার আশীর্বাদ জানিও।"

মায়ের কথা উঠল এবার। "মা আপনাকে একটা চিঠি লিখে ফেললেন।"

কুমারের হাত থেকে নিয়ে চিঠিটা পড়লাম। আইলীন লিখেছেন, "তোমার সঙ্গে বিদায়ের আগে দেখা হলো না। কুমার ভারতবর্ষে যাচ্ছে—ওর বাবার ইচ্ছে নয়, আর দেরি হয়। ওকে পথে দেখো। ইতি আইলীন।"

"তোমার বাবা আর কিছু বলেননি?" আমি প্রশ্ন করলাম কুমারকে।

"কই না তো। আপনার কিছু জিজ্ঞেস করবার ছিল?"

আবার মিথ্যে বললাম—"না, এমনি জিজ্ঞেস করছি।"

আমার মধ্যেও একটা লজ্জা লজ্জা ভাব আসছে। এটা মোটেই ভাল নয়। আমি মনকে একটা নিঃশব্দ ধমক লাগালাম। নিজেকে সামলে নেবার জন্য নারীচিন্তা আরম্ভ করলাম। কুমার অন্য একজনের সঙ্গে কথা বলবার জন্যে ভাগ্যে একটু এগিয়ে গিয়েছে।

আমি ওর চুলগুলো দেখছি। অমন সুন্দর চুলের অযত্ন। আমেরিকান মহাদেবের ওই জটায় আটকে পড়ে কত বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী ধড়ফড় করবে!

এইবার মনকে আমার নিজের সুন্দর চুলের কথা স্মরণ করতে বললাম। এই চুলের ফাঁদেও যে হু'একজন ধরা পড়েনি এমন নয়। মনের ইচ্ছে হচ্ছিল না ওইসব চিন্তায় ঢুকতে—কিন্তু জোর করেই বেটি বলে সুইডিশ মেয়েটার কথা ভাববার হুকুম দিলাম।

রাষ্ট্রসঙ্ঘে কাজ করতে এসে কুমারী বেটি ছুটিতে মার্কিন মুলুক ভ্রমণ করছিল গাড়ি করে। তখন নতুন এসেছি। প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্য উপভোগের লোভে একা বনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। বেটির গাড়ি খারাপ হলো ঠিক বনের ধারে। যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হলো!

অরণ্যমধ্যে একাকিনী সালঙ্কারা যুবতী। আর আমি ইয়ং ম্যান অফ এ্যাকটিভ হ্যাবিটস্! বুঝুন, গাড়ির বনেট খুলে কলকব্জা টেপাটেপি করে আরো গোলমাল করে দিলুম ইচ্ছে করে। এমন সুন্দরী বালিকার গাড়ি যদি এখনই ঠিক হয়ে যায়, তাহলে আলগোছে একটি থ্যাংক ইউ ছুড়ে দিয়ে পালাবে। তাতেই গদ্‌গদ হবার মতো বয়েস কেটে গিয়েছে অনির্বাণ চাটুজ্যের।

ভাগ্যে ছুঁড়ী গাড়ির কলকব্জা তেমন বুঝতো না—এই মেমসাহেব-গুলোকে বিশ্বাস নেই, ব্যাটাছেলের বাড়া, কোথায় যে কী বিদ্যা রপ্ত করে রেখেছে, ঠিক নেই। আমি এক ঘণ্টা ধরে ঠুকঠাক করলাম, আমার গাড়ি থেকে যন্ত্রপাতি এনে গাড়ির তলায় শুয়ে পড়লাম। তারপর বালিকার মন গললো—বললে, "মিস্টার চ্যাটার্জি, আমার গাড়িতে স্যাণ্ডউইচ আছে, এসো হু'জনে খাই।"

হাতটা রুমালে মুছে নিয়ে হু'জনে একটা গাছের তলায় গিয়ে বসেছিলাম। পশ্চিমের মেয়েদের নেকু-নেকু ভাবটা কম। কলকাতার এম. এস-সি, পি-এইচ ডি মেয়ে হলেও এই পরিস্থিতিতে খেলা দেখাতো।

বলতো, ভয় করছে, বুক ধড়ফড় করছে, কী হবে বলুন তো! শাড়ি সামলে কোথায় বসবে ঠিক করতেই পাঁচ মিনিট লাগিয়ে দিতো। তাল রেখে আমাকে আদিখ্যেতা দেখিয়ে যেতে হতো। এ-মেয়ে ধড়াস করে ফর্সা ফ্রক নিয়েই ঘাসের ওপর বসে পড়লো।

স্যাণ্ডউইচে বিরাট একটা কামড় দিয়ে বললে, "আমাকে বেটি বলে ডাকবে। তোমার বিরাট নাম আমি মনে রাখতে পারবো না, তোমাকে অনি বলে ডাকবো।"

যে-নামে খুশী ডাকো, শুধু একটু কৃপাদৃষ্টি দিও। গপ গপ করে স্যাণ্ডউইচ খাওয়া হলো, খিল খিল করে হাসাহাসি হলো। তারপর আবার গাড়ি সারাবার কাজে লেগে গেলাম।

গাড়ি চালু করে, কালিঝুলি মেখে যখন বেরিয়ে এলাম, তখন বালিকার মুখে মিষ্টি হাসির মুক্তো ঝরে পড়তে লাগল। বললাম, "এখনই সব হাসি খরচ করে ফেলো না। একটু চালিয়ে দেখো, ঠিক আছে কিনা।"

যুবতীর বিবেচনাবোধ আছে। আমাকে বললে, "তোমাকেও তাহলে পাশে বসতে হবে।"

তা শিক্ষিত সুশালীন যুবক; আমরা বাবা-মায়ের অবাধ্য হতে পারি, কিন্তু সুন্দরী যুবতীর অনুরোধ ঠেলতে পারি না। চড়লাম। আধমাইল চক্কর দিয়ে বনের আরও ভিতরে ঢুকে গেলাম। মনের মধ্যে একটু ধুকপুকানি ছিল না এমন নয়। আমার নিজের গাড়িটা প্রতি মুহূর্তে সরে যাচ্ছে। বললাম, "চমৎকার চলছে গাড়ি। এবার ফিরাও মোরে।"

গাড়িটা ঘুরিয়ে নিল সে। ড্রাইভিং-এ এদের জন্মগত অধিকার। আর যেমন স্টিয়ারিংটা তেমন সুন্দর নরম নরম মাখন-মাখন হাত দুটো। সেই যে রেকর্ডের গানটা—এক সময় খুব হৈ চৈ হয়েছিল; মনে পড়ে গেল—সোনার হাতে সোনার কাঁকন কে কার অলঙ্কার?

সোনার হাতটা এবার স্টিয়ারিং ছেড়ে দিল, গাড়ি থেমে গেছে। আমরা আবার পুরনো জায়গায় ফিরে এসেছি—আমার ফোকস-ওয়াগেনখানা সতী রমণীর মতো আমার দিকে বিরক্তভাবে তাকিয়ে রয়েছে। গাড়ি থেকে নামলাম আমি। বেটিও নামল। আমার মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছে। বেটির হৃদয়যন্ত্রে ধরা পড়বার জন্যে আমার হৃদয় নিঃশব্দে হাজার হাজার বেতার বার্তা পাঠিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। বোধহয় ওর মিটারটা ধরতে পারিনি।

বেটি এবার আমার দিকে তাকালে। বললে, "তোমাকে কেমন করে ধন্যবাদ দিতে হয় জানি না। তোমার জন্যে কিছু করতে পারি?"

"কি আর করবে। দেশে ফিরে গিয়ে তোমার বয় ফ্রেণ্ডকে বাড়তি চুম্বন কোরো," কেমন সহজে বলে ফেললাম। স্বয়ং বাগ্‌দেবী না ভর করলে এমন সাহিত্যিক ভাষা আমার জিভ দিয়ে কেমন করে বেরুবে?

বেটি এবার হাসলো—সেই হাসি আইসবার্গের মতো, যার এক দশমাংশ মাত্র প্রকাশিত হয়, আর বাকিটা হাসির মালিককে ঈষৎ রাঙা করে তোলে। বেটি নিজের গাড়ির দরজাটা আবার খুলতে গিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়াল। তারপর নিজের গালে বাঁ হাত দিয়ে বললে, "দুষ্টু ইণ্ডিয়ান, তোমার চুলগুলো ভারি সুন্দর।"

এরপর আমি আর এক মুহূর্ত দেরি করিনি। নিজের গাড়ির দরজাটা বন্ধ করে মাপা পায়ে সোজা বেটির খুব কাছে—যত কাছে যাওয়া সম্ভব—এগিয়ে গিয়েছি।

তারপর? দুটো মালিকহীন গাড়ি অনেকক্ষণ রাস্তায় একসঙ্গে পড়েছিল। আমরা বনের মধ্যে, গভীর বনের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলাম …এবং তার অনেক পরে সূর্য অস্ত গিয়েছিল।

"মাস্টারমশায়," কুমারের ডাকে আবার চমকে উঠলাম। ওর সম্ভাষণের মধ্যে আমেরিকান ভাব প্রবল, অথচ বেচারি কেমনভাবে

মনেপ্রাণে ইণ্ডিয়ান সাজবার চেষ্টা করছে।

"আপনি কিছু ভাবছেন? অনেকদিন পরে দেশে ফিরছেন।" কুমার এবার আমার মুখের দিকে তাকালো।

কিন্তু আমার মনের মধ্যে তোমাকে কিছুতেই ঢুকতে দিচ্ছি না। সেখানে এই মুহূর্তে তোমার বাবাকে কেন্দ্র করে একটু আলোড়ন চলছে। তোমাকে বিভ্রান্ত করবার জন্যে আমার সেই বিখ্যাত হাসিটা ব্যবহার করি। এই হাসিটায় আমাকে একেবারে কচি সরল শিশুটির মতো দেখায়—লোককে আমি এইভাবেই ভুল পথে চালিয়ে দিই, আমার ঠিকানা খুঁজে পায় না তারা।

বললাম, "তোমার মায়ের শরীর ভাল তো?"

"ফাইন। খুব ভাল আছেন।"

"তোমাদের সেই রক্তজবা গাছটায় এখন কীরকম ফুল ফুটছে?"

"গতকাল যা ফুল ফুটেছে, আপনাকে কী বলবো। এখানে কোনো মন্দির থাকলে গডেস কালীকে একশ আটটা রেড অরিয়েণ্ডার অফার করা যেতো।"

এবার কী জিজ্ঞেস করি? কুমারই আমাকে রক্ষা করলে। "আপনি যে লঙ্কা গাছের বীজ আনিয়ে দিয়েছিলেন মনে আছে! বাবার সে কী আনন্দ। হোয়াট ডু ইউ কল দোজ চিলিজ?" কুমারের বাংলা আটকে গেল। ওর ওই অসুবিধা। বাংলায় সমস্ত ভাব প্রকাশের জন্যে ব্যাকুল, যথাসাধ্য চেষ্টাও করে, কিন্তু আটকে যায়। তখন ছটফট করতে থাকে।

বললাম, "ধানি লংকা।"

"হোয়াট ইজ ধানি, মাস্টারমশায়?"

কুমার এবার নোটবুক খুলে লিখতে আরম্ভ করলে। আমি বললাম, "ঠিক ধানের মতো ছোট ছোট। ধান ক্ষেতে হয় অনেক সময়। ছোট, কিন্তু ঝালের রাজা।"

"অর্থাৎ কিনা ঝালের প্রেসিডেন্ট !" অধ্যাপক নিমাই মুখুজ্যে এবার আমাদের কথার মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

নিজের বিরক্তিকর রসিকতায় নিজেই হাসতে হাসতে আমার দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছেন। নিউটন ইউনিভার্সিটির ফিজিয়লজি বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর নিমাই মুখুজ্যে। নিমাই মুখুজ্যে সব কিছু কণ্ট্রোল করেন—খাওয়া-দাওয়া, ওজন, মনের ভাব। যৌবনও কণ্ট্রোল করতে চেষ্টা করছেন, পঁয়তাল্লিশ বছরটাকে চেপেচুপে চল্লিশে রেখেছেন। কিন্তু ওঁর ধারণা এখনও বত্রিশে আছেন।

আমাদের কথাবার্তা আটকে গেল। এবারে প্লেনে যাবার ডাক হয়েছে। আমরা অনেকগুলো লোক এখানে ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছি।



টারম্যাক দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা বোয়িং ৭০৭-এর দিকে চলেছি। সিঁড়ির কাছেই একটা লোক আমার বোর্ডিং কার্ডের কিছুটা ছিঁড়ে নিল। লোকটা বোধ হয় আমার দেহমনেরও কিছুটা ছিঁড়ে পকেটে পুরে দিল। আমার কিছুটা যেন এই দেশে, এই আশ্চর্য দেশে ফেলে যাচ্ছি। অথচ তোমরা ইচ্ছে করলেই এর সবটাই রাখতে পারতে। রাজবল্লভ সাহা সেকেণ্ড বাই লেন সম্বন্ধে আমার মনে এখনও কোনো আগ্রহ জাগছে না।

সিঁড়ি থেকে সবাই একবার পিছনে ফিরে ওপারের ব্যালকনির দিকে তাকাচ্ছে। ওখানে অনেকেই হাত নাড়ছে, রুমাল নাড়ছে। আমার ওখানে তাকাবার কোনো প্রয়োজন নেই। তবু কী যে হলো, না তাকিয়ে পারলাম না।

একি দেখছি আমি? ওই তো? বেণীমাধব রায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন ওখানে। অপরাহ্ণের পড়ন্ত সূর্যের আলোয় দেখলাম বেণীমাধব রায় হাত তুলেছেন তাঁর ছেলের উদ্দেশে। কুমার এদিক থেকে হাত তুললে। বেণীমাধব বোধ হয় আমাকেও দেখতে পেয়েছেন। না দেখলেই ভাল হতো।

বেণীমাধবকে আজ খুবই আনন্দিত মনে হচ্ছে। আনন্দে চোখদুটি তাঁর সজল হয়ে উঠেছে তা আমি বুঝতে পারছি। বেণীমাধব তাঁর সন্তানকে সেই অভ্যস্ত কায়দায় আশীর্বাদ করছেন—বেঁচে থাকো, বাবা-মায়ের মুখ উজ্জ্বল করো।

আমার কী কর্তব্য? আমারও উচিত ওঁর দিকে হাত নাড়া। কিন্তু বেণীমাধব যদি তা গ্রহণ না করেন? যাবার সময় বেণীমাধব আমার অভিবাদন প্রত্যাখ্যান করলে খুব খারাপ লাগবে। আমার মনের মধ্যকার পশুটা হয়তো বেণীমাধবেরও কোনো ক্ষতি করতে চাইবে। এর মধ্যেই পশুটা বলছে, ওইটুকুতেই বেণীমাধব এত বিরক্ত হয়েছেন তোমার সম্বন্ধে। আর অনির্বাণ চাটুজ্যেকে যদি পুরোপুরি জানতেন, তাহলে কী হতো?

আমি ওঁর দিকে হাত নাড়াতে পারলাম না। কিন্তু কুমারকে বাঁ হাতে জড়িয়ে ধরলাম। ওর মা অন্তত দেখুন, পথে ওঁর ছেলের দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়েছি। আইলীনকে আমি পরে চিঠির উত্তর দেবো।

কুমার এখনও বাবা-মায়ের দিকে হাত নাড়ছে। নাড়ুক না, ক্ষতি কী? আমার খুব ইচ্ছে করছে বেণীমাধবকে এবার অভিবাদন জানাতে। এমনভাবে হাত নাড়ালুম যাতে উনি বুঝতে পারলেন না।

এবার সব যাত্রী ঢুকে পড়েছে। সুতরাং আমাদেরও ঢোকবার পালা।

দরজার কাছে জাপানী মেয়েটা মিষ্টি হেসে আমাদের অভ্যর্থনা

করলে। এই এক নতুন কায়দা হয়েছে—যাত্রীদের মনোরঞ্জনের জন্যে জাপানী মেয়ে লেলিয়ে দেওয়া। দেখুন অবস্থাটা। এই কোম্পানির এত প্লেন, এত টাকা, তবু আরও টাকার জন্যে নিজেদের মেয়েদের বদলে জাপানী মেয়ে ঢুকিয়েছে। যখন যা ফ্যাসান—এখন জাপানী মেয়েরাই ফ্যাসান হয়ে উঠেছে। ওই যে দূরের সীটে ছোকরা আমেরিকান দেখছেন, ওর নাম কার্ল লিগেট। আমার সঙ্গে খুব চেনাশোনা। বাপের টু পাইস আছে। লেখাপড়াও করে, আবার ফুর্তিও করে। সময় পেলেই দেশ-বিদেশের খাবার আর মেয়ে চেখে বেড়ায়। ওকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম এই জাপানের মেয়ে রপ্তানি সম্বন্ধে।

ভারি আমুদে ছোকরা, ওর পাশেই তো দেখছি আমাদের সীট পড়েছে। জানালার ধারে আমার সীট পড়েছে। "হাই—কার্ল।"

"হাই অনি।" এবার কার্ল তার সেই বিখ্যাত কায়দাটা ছাড়লো। স্রেফ বাংলায় বলে ফেললে, "কেমোন আছেন?"

মনে মনে কার্লের গুষ্টি উদ্ধার করলাম। গুরুমারা বিদ্যে ফলাচ্ছে শ্রীমান কার্ল। বুদ্ধিটা আমিই দিয়েছিলাম ওকে। মেয়েদের যদি পটাতে চাও তাহলে তাদের মাতৃভাষায় দু'একটা কথা শিখে রাখবে। আমেরিকান তো, তার ওপর কমপিউটার নিয়ে কাজ করে। দুটো কথা স্ট্যাণ্ডর্ড করে নিয়েছে—"কেমন আছেন?" তারপর সুযোগ পেলে: "আপনি বড় সুন্দর।" কার্ল আমাকে ওর নোট বইটা দেখিয়েছিল—ইংরিজী অক্ষরে দুনিয়ার কত ভাষায় যে কথাটা লিখে রেখেছে। আমি তো মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলাম। "করেছো কি কার্ল! বাংলা থেকে সোমালি, কোনো ভাষা বাদ দাওনি।"

কার্ল বলেছিল, "কখন কোন ভাষা কাজে লাগবে কেমন করে জানবো বলো?"

কার্ল এখন পা গুটিয়ে আমাকে জায়গা করে দিল। বললাম, "কার্ল, সেদিন জাপানী মেয়ে সম্বন্ধে তোমার থিসিস দিচ্ছিলে।"

"হ্যাঁ, পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র জাপানী মেয়েরাই পুরুষের মনোরঞ্জনের বিষয়টা সিরিয়াসলি নিয়েছে।"

"আর মার্কিন মেয়েরা?" কার্লকে উসকে দেবার জন্যেই জিজ্ঞেস করি।

"ওদের কথা আর বোলো না অনি। ইচ্ছে হয় বিবাগী হয়ে চলে যাই। লম্বা মোটর গাড়ির পিছনের সীটে এদের নিয়ে প্রেম করা যায়। কিন্তু বিয়ে করেছো তো মরেছো! সারা জীবন জ্বালিয়ে খাবে।" দুঃখের সঙ্গে কার্ল বললে, "রান্না জিনিসটাকে শ্রীমতীরা দেশ থেকে তুলে দিল—অথচ প্রত্যেকটি মেয়ে হাজার হাজার ডলারের কিচেন ইউটেনসিল কিনছে।"

"তাহলে উপায়?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"উপায় সোজা—চীনেদের পথ অনুসরণ করো।"

"মনে রেখো কার্ল তুমি মার্কিন নাগরিক, তোমার পকেটে ইউ এস পাসপোর্ট," আমি কার্লকে সাবধান করে দিই।

"সো হোয়াট? পৃথিবীর মধ্যে আর কোন জাত খারাপ রান্নাকে ডাইভোর্সের গ্রাউণ্ড করতে সাহস করেছে? চীনেরা আত্মবিস্মৃত জাতি—খারাপ রান্নার জন্যে ডাইভোর্স দেওয়া বন্ধ করেছে বলেই তো জাতটা এত বেরসিক হয়ে উঠেছে।"

আমি এবার জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। ব্যালকনির লোকগুলো আরও অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবু বেণীমাধব রায়কে আমি এখনও দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তিনি বোধহয় আমাদের আর দেখতে পাচ্ছেন না, তাই ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন গোটা বোয়িং ৭০৭ প্লেনটার দিকে।

আমার মাথার ওপরের কলিং বেলটা টিপে দিলাম। এই বেল টিপলেই কোন হোস্টেসকে আসতে হবে। খুব কাছ থেকে বিমান-বালিকাদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে আমার ভাল লাগে। কেমন একটা পুতুল পুতুল ভাব থাকে ওদের মুখেচোখে। ভাবছেন ওই দেখাই সার।

তা হলে কিছুই জানেন না। কত বিমান-বালিকা যে মধ্যগগনে প্যাসেঞ্জারের প্রেমে পড়ে যায় তার হিসেব নেই। মহাশূন্যে চার চোখের যে শুভদৃষ্টি হয়, তা মাটিতে এসে পাকাপোক্ত হয়েছে এমন নজির আপনি ক'টা চান?

বেল যখন টিপেছি, দেখি কোন সুন্দরী আসেন!

কপাল নেহাতই মন্দ। চার চারটে বালিকার মধ্যে সবচেয়ে বুড়িটাই আমার কাছে এল। তোমার বাপু আর হোস্টেস হওয়া মানায় না—তুমি পিসিমা সেজে ঘর-সংসার সামলাওগে যাও, না হয় সিটি বুকিং অফিসের সেলস্ কাউন্টারে টিকিট বেচো।

তবু যখন এসে দাঁড়িয়েছে তখন দেঁতো হাসিতে মুখ ভরাতে হলো। চোখের তারায় একটু দুষ্টুমিভরা স্পিন দিলুম। বললাম, "মিস, তোমার হাতেই জান কবুল করেছি। যদি এই যুবকের বেঘোরে মৃত্যুর কারণ না হতে চাও, তা হলে এক পেগ হুইস্কি আনো।"

বুড়ী এখন আইন দেখাচ্ছে। "স্যরি। প্লেন শূন্যে না ওঠা পর্যন্ত কোনো পানীয় সার্ভ করার আইন নেই।"

চোখে আরও স্পিন ছাড়লাম। সমস্ত মুখে করুণভাব ফুটিয়ে তুললাম। এবার ডীপ-ফ্রিজে রাখা শ্রীমতীর হৃদয় একটু উষ্ণ হলো। লুকিয়ে একটা খোকা বোতল রেখে গেল। বিনা সোডা, বিনা জলে খানিকটা স্কচ গলায় ঢেলে দিয়ে কার্লের দিকে বোতলটা এগিয়ে দিলাম।

কার্লের পাশে-বসা কুমারের দিকে নজর পড়লো। ওর দিকেও বোতলটা এগিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। হাজার হোক ছোকরা ইন্দো-মার্কিন সম্পর্কের একটি চলমান মনুমেন্ট। অর্ধেক ভারতীয় অর্ধেক আমেরিকান। কিন্তু ওর এই সব তরল ব্যাপারে তেমন খেয়াল নেই। ইতিমধ্যেই একটা ঢাউস বই খুলে বসেছে।

একটু আড়চোখে বইটার দিকে তাকিয়ে মেজাজটা খিচড়ে গেল।

পড়বি তো পড় কামসূত্র পড়, কিংবা ভারতের মন্দির গাত্রের মিথুনমূর্তির ছবি দেখ—ভাল ভাল বই আছে এসব বিষয়ে। তা নয়, 'ডিসকভারি অফ ইণ্ডিয়া'—জহরলালের ভারত সন্ধানে। ছুরছাই—এখন কী অশ্লীল বই পড়ার সময়। কবে কোথায় কে ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করতে গিয়ে ঠোক্কর খেয়েছে, তারপর অনেক সাধ্যসাধনা করে ইণ্ডিয়াকে খুঁজে বার করেছে, তাতে আমার কী? মাঝে মাঝে হিসটি্তে কতকগুলো লোক বড্ড ডিসটার্ব করতে আসে। বেশ ঠিকঠাক চলেছে, চন্দ্রসূর্য উঠছে, মাঠে ধান হচ্ছে, গোরু দুধ দিচ্ছে, ঘরে ঘরে নিত্যনিয়মিত ছেলেপুলে হচ্ছে,—তখন নিজের ঘরদোর না-সামলে বনের মোষ তাড়াবার ইচ্ছে হয় কিছু মানুষের। তাদের কেউ কন্যাকুমারিকার শেষ শিলাখণ্ডে বসে মহামানবতার কথা ভাবতে আরম্ভ করে, কেউ পরিব্রাজক হয়ে বেরিয়ে পড়ে, কেউ সাউথ আফ্রিকায় চলে যায়, কেউ পণ্ডিচেরিতে ছোটে, কেউ জেলে যায় এবং বই লিখতে বসে। অশান্তি বাড়ায়। আমি চাটুজ্যে বাউন, আমার বাপ বোকা হতে পারে, আমি বাস্তুঘুঘু, আমি ওসবের মধ্যে একদম নেই।

ইতিমধ্যে সামনের আলোটা জ্বলে উঠে আমাদের বেল্ট বাঁধার নির্দেশ দিল। তারপর এয়ার হোস্টেসের সেই পুরনো গৎ: 'আমাদের কোম্পানির বোয়িং ৭০৭-এ তোমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি! আমরা এখন টোকিওর হানাদা এয়ারপোর্টে চললাম। তোমাদের ক্যাপটেনের নাম পিটার লং। তোমরা ধূমপান বন্ধ করো। আমরা মহাশূন্যে পৃথিবী থেকে এতো ফুট ওপর দিয়ে যাবো। এই প্লেন পুরোপুরি 'প্রেসারাইজড্'। যদি কোনো কারণে প্রেসার কমে যায়—সম্ভাবনা নেই বললেই চলে—সঙ্গে সঙ্গে তোমার মাথার কাছ থেকে টুক করে একটি অক্সিজেনের মুখোশ নেমে আসবে। মুখোশটা কেমন ভাবে ব্যবহার করতে হয় সেটা তোমাদের দেখাচ্ছেন আমাদের বিমান-সেবিকারা।'

এই মুখোশ দেখে দেখে আমি এলে গিয়েছি। এখন আমি, যারা মুখোশ দেখাচ্ছে, তাদের দেখি। এই জাপানী মেয়েটা মন্দ নয়—কচ্ছপের মাংস দিয়ে তৈরি সুন্দরী মহিলা, হাড়গোড় আছে মনে হয় না। আমার আবার ছোটবেলা থেকে শুধু মাংস ভাল লাগে না—হাড় মাংস মিশিয়ে দিতেন মা। হাড় ভাঙতে একটু মেহনত, কিন্তু চিবোতে অনেক মিষ্টি!

মুখোশ ছেড়ে মেয়েটা লাইফ জ্যাকেট পরে ফেললে। মাইকে তখন বলা হচ্ছে, 'যেহেতু আমরা অনেকক্ষণ ধরে মহাসমুদ্রের ওপর দিয়ে উড়ে যাবো, সেই হেতু আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা নিয়ম অনুযায়ী এই জ্যাকেট দেখানো হচ্ছে। এই জ্যাকেট কী করে ফোলাতে হয় লক্ষ্য করুন। বিস্তারিত বিবরণ আপনার সামনে রাখা বিপদে নিরাপত্তা নামক সচিত্র পুস্তিকায় পাবেন।'

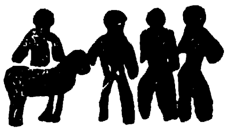
মেয়েটা দেখলাম কি টিপছে, আর জামার মতো লাইফ জ্যাকেটটা ফুলে উঠছে। দাও-না বাবা ওইরকম একটা জ্যাকেট এখনই। নানা বিপদের সমুদ্রে কেবল নিজের চেষ্টায় ভেসে রয়েছি। চেষ্টা না করে ভেসে থাকার কল পেলে আর কোনো দুঃখ থাকে না!

কোমরে সেফটি বেল্ট না বেঁধেই বসেছিলাম। কিন্তু এয়ার হোস্টেসের নজরে পড়ে গেলাম। যুবতী ভাবলে এই প্রথম বোধ হয় আমার বিমানবিহার। ঝুঁকে পড়ে আমার কোমরে নিরাপত্তা বন্ধনী বেঁধে দিতে সাহায্য করলে। মেয়েটি বেশ খানিকটা ঝুঁকে পড়েছে, বুঝতেই পারছেন এইভাবে মেয়েরা ঝুঁকে পড়লে ভগবানের দেওয়া কয়েকটি এক্সক্লুসিভ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কী অবস্থা হয়। আমি তো বোকা সেজে চুপচাপ বসে আছি। শুধু আলতো করে একটা মিষ্টি থ্যাংক ইউ ছুঁড়ে দিলাম। তাতেই আহ্লাদে ডগমগ হয়ে বালিকা চলে গেল। বুঝলে না আমার মনের মধ্যে কীরকম নর্দমা ঘাঁটা হয়ে গেল।

বোয়িং ৭০৭ রানওয়ে ধরে শতাধিক যাত্রী নিয়ে চলতে শুরু করেছে।

ভিতরে আমরা কোনো শব্দ পাচ্ছি না। কেমন ভাল ছেলের মতো মোটরগাড়ির গতিতে এগিয়ে চলেছে—আর বাইরে এই জেটের বায়ু নিষ্ক্রমণে কী কান ফাটানো আওয়াজ হচ্ছে আন্দাজ করুন।

অনেক দূরে গিয়ে প্লেনটা ঘুরে দাঁড়াল, তারপর রেসে জেতবার জন্যে হাঁটুর ওপরে কাপড় তুলে মারলে ছুট। এক মুহূর্তের জন্যে দেহটা হাল্কা হয়ে গেল—কে যেন এই বুড়ো খোকাকে আচমকা কোলে তুলে নিল। আমরা স্নেহময়ী পৃথিবীর আশ্রয় ত্যাগ করে উপরে উঠে পড়েছি। আর সেই মাটিছাড়া অবস্থায় এয়ারপোর্টের ব্যালকনিটা দেখতে পেলাম। মনে হলো বেণীমাধবের উজ্জ্বল শ্যাম প্রবীণ দেহটা তখনও আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আমার মনটা আবার বিক্ষিপ্ত হতে চলেছে। আমি সোজাসুজি বলতে চাই—আমার বাবা হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী, এই বেণীমাধব রায়, এদের কাউকে আমি তোয়াক্কা করি না। আমি এই দুনিয়াতে এসেছি, নিজের দমে যতটা পারি চলবো। হারাণবাবু, বেণীমাধব রায়, আপনারা আমার অঙ্ক গুলিয়ে দেবেন না বলছি।



কোমরে দড়িবাঁধা অবস্থায় চলৎশক্তি রহিত হয়ে পড়ে রয়েছি আর এই সুযোগে স্মৃতির লাটাইটা উল্টোদিকে ঘুরে ঘুরে অতীতকে আমার চোখের সামনে নিয়ে আসছে।

আমার বাবা হারাণচন্দ্র শাস্ত্রীকে দেখতে পাচ্ছি, হাতে একখানা লাল মলাটের পাতলা বই। পাঁজির কাগজে ছাপা, বিদ্যাসাগর বাটীর মনোগ্রাম মার্কা বইটার ওপর কালো কালির চারটে অক্ষরে—বোধোদয় —আমাকে গিলতে আসছে।

বাবার গৌর বর্ণ। খালি গায়ে ঘাম ঝরে পড়ছে, উপবীতটাও ভিজে চপ চপ করছে। বাঁ হাতে তালপাতার পাখাটা ঘোরাচ্ছেন, আর সামনে আমি আসামীর মতো মাথা নীচু করে বসে রয়েছি। বাবা আবার প্রশ্ন করলেন, "যেসকল বস্তুর জীবন আছে, অথচ জন্তুর ন্যায় গমনাগমনের শক্তি নাই, তাহাদের কী বলে?"

"কী হলো, চুপ করে আছিস কেন? উত্তর দে!"

বাবার রুদ্রমূর্তি দেখে মা ছুটে এসেছিলেন। "আহা ছোট ছেলে, জানে না, বলে দাও।"

বাবা বইটা ছুড়ে দিলেন আমার দিকে। বইটার দিকে তাকিয়ে আমি উত্তর দিলাম, "উদ্ভিদ।"

শ্রদ্ধেয় বিদ্যাসাগরমশায়, এই বোয়িং ৭০৭-এ চড়ে আপনাকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে, আমার দিকে তাকিয়ে দেখুন, আমার জীবন আছে, গমনাগমনের শক্তি নেই। আমি কি তাহলে উদ্ভিদ?

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পরম ভক্ত খ্যাতনামা সংস্কৃত পণ্ডিত হারাণচন্দ্র নিজের সন্তানকে মানুষের মতো মানুষ করবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছিলেন। রিপন কলেজিয়েট স্কুলের সংস্কৃত মাস্টারমশায়ের শখ কত! ছেলে হওয়ার সংবাদ পাওয়ামাত্র অভিধান খুলে বসেছিলেন নাম খোঁজবার জন্যে।

আপনাদের সকলের কাছে গলায় গামছা দিয়ে অনুরোধ করছি, ছেলেপুলে হলেই নামের খোঁজে অভিধান খুলে বসবেন না। নিজে যা হতে পারেননি, যা হবার মুরোদ নেই, তা আপনার বংশধরের কাছে প্রত্যাশা করে তার হাড় জ্বালাবেন না। এই যে আমার বাবা অনেক ভেবেচিন্তে নাম খুঁজে বার করলেন—অনির্বাণ—কী লাভ হলো? এর সঙ্গে যে অনেক স্বপ্ন, অনেক প্রত্যাশা, অনেক আদর্শ জড়িয়ে আছে তা আমার কী খেয়াল থাকে?

পূজ্যপাদ হারাণচন্দ্রবাবু, আপনি যেখানেই থাকুন, আপনাকে এইটুকু

বিনীত নিবেদন করতে চাই, অনির্বাণ কথাটাই অবাস্তব। নিভবে না এমন কোনো আগুন কল্পনাও করা যায় না। অমন যে অমন সূর্য তাও একদিন স্রেফ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

পিতৃদেব, আপনার খড়ম-পরা পা দুটো আমি মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আমার মুখে হুইস্কির গন্ধ, আমার পকেটে রবারের নানারকম সাজসরঞ্জাম—আপনার মতো সাত্ত্বিক মানুষের পায়ে হাত দেবো না।

দুনিয়ার লোক দেখতুম আমার বাবাকে খাতির করতো। তাঁর পাণ্ডিত্য, তাঁর নিষ্ঠার জন্যে দূরদূরান্তরের লোকরা ছুটে আসতো আমাদের রাজবল্লভ সাহা সেকেণ্ড বাই লেনের চতুষ্পাঠীতে। পণ্ডিত মানেই গরীব হয়—আচার্যের স্ত্রীর নতুন কাপড় জোটে না। আমাদের কিন্তু তেমন খারাপ অবস্থা ছিল না। আমার মায়ের রঙ ছিল টুকটুকে। টকটকে লালপেড়ে বাসীকরা শাড়ি পরতেন আমার মা। আর ছিল গয়না, অনেক গয়না—আমার মায়ের সোনার শরীরে বেশ মানিয়ে যেতো। আমার দাদামশাই একখানা সংস্কৃত উপক্রমণিকা লিখে টু-পাইস করেছিলেন। আমরা তার ফলস্বরূপ একখানা দোতলাবাড়ি, কিছু কোম্পানির কাগজ, এবং আমতায় বেশ কয়েক বিঘা ধানজমি ভোগ করছিলাম।

বাবা বলতেন, "সংসারে এই একখানা বই যদি কেউ ভাল করে পড়তে পারে, তাহলে সে তরে গেল। তুই মন দিয়ে বোধোদয়খানা পড়ে যা, না হলে পরে আফশোস করবি। ভিত খারাপ হলে পরে বাড়ি ধ্বসে পড়বে। বোধোদয় হচ্ছে ভিত।"

বুঝুন আমার অবস্থাটা। আজকালকার ছেলেরা বোধোদয়ের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে কিনা জানি না। আমার হাড়ে হাড়ে রক্তের মধ্যে বোধোদয় গুলে ইঞ্জেকশন করে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

বিশ্বাস না হয়, আমাকে ধরুন। মুখস্থ বলে যাবো : "আমরা ইতস্ততঃ যে সকল বস্তু দেখিতে পাই, সে সমুদয়কে পদার্থ বলে। পদার্থ দ্বিবিধ ; সজীব ও নির্জীব। যে সকল বস্তুর জীবন আছে, অর্থাৎ যাহাদের জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু আছে, উহারা সজীব পদার্থ।"

পড়াতে পড়াতে বাবা একটু থামতেন। আর আমার মাথায় উদ্ভট প্রশ্ন খেলে যেতো। প্রশ্ন করতাম, "আমি তাহলে সজীব পদার্থ, বাবা ?"

"নিশ্চয়। এতে আবার সন্দেহ কী ?"

এখনকার পাকা বুদ্ধি থাকলে পিতৃদেবকে বিপদে ফেলে দিতাম। প্রশ্ন করে বসতাম, "আমার জন্ম হয়েছে, আমার বৃদ্ধি হচ্ছে (প্রতি বছর পায়ের জুতো ছোট হয়ে যাচ্ছে)। কিন্তু আমার মৃত্যু হবে কী করে ? আমি তো অনির্বাণ।"

তখন মাথায় অত বুদ্ধি নেই, তাই একমনে বাবার কথা শুনে যাচ্ছি। তিনি তখন আমাকে বোঝাচ্ছেন, "নির্জীব জড় পদার্থের মৃত্যু নেই।"

মৃত্যুর ব্যাপারটা তখনই বুঝি। তাই মনে হয়েছে, জড় পদার্থ হওয়াটাই সুবিধে—একস্থান থেকে অন্যস্থানে নাই বা যেতে পারলো, আমার রাঙাদিদিমাও তো শেষ জীবনে নড়তে পারতো না, খাটেই শুয়ে থাকতো, তবু মারা গেল।

বাবাকে এসব বলিনি। আমার মনোভাব আন্দাজ করতে পারলে তখনই পাখার বাঁট আমার পিঠে বসিয়ে দিতেন।

পদার্থের পরই ঈশ্বরের অনুচ্ছেদ পড়িয়েছিলেন বাবা। আপনাদের কাছে সোজাসুজি বলছি, ঈশ্বর ভদ্রলোক আমার মাথায় থাকুন, ওঁর সম্বন্ধে মাথা ঘামিয়ে অযথা সময় নষ্ট করতে ইচ্ছে হয় না। অনেক কথা ঈশ্বর সম্বন্ধে বলতে পারি ; ওই সামনের সীটের নিমাই মুখুজ্যে, কিংবা আরও এগিয়ে মিসেস ইন্দ্রাণী সেনের মতো ঈশ্বরের বহু কেলেঙ্কারি ফাঁস করে দিতে পারি। কিন্তু এই মুহূর্তে হাওয়ায় ভেসে রয়েছি বলে ঈশ্বর

ভদ্রলোককে ঘাঁটাতে ইচ্ছে করছে না।

কী ফ্যাসাদ বলুন তো ঈশ্বরকে নিয়ে। উনি জড় নন, জন্তু নন, মনুষ্য নন—উনি এ-সবের বাইরে, স্রেফ ঈশ্বর। "ঈশ্বরকে কেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু তিনি সর্বত্র বিদ্যমান।" তার মানে এখানেও তিনি বিনা-টিকিটে পরিভ্রমণ করছেন। বাবা লাল পেন্সিলে আমার বইতে দাগ দিয়ে দিয়েছিলেন: "আমরা যাহা করি, তিনি তাহা দেখিতে পান; আমরা যাহা মনে ভাবি, তিনি তাহা জানিতে পারেন।"

নাঃ, তাহলে তো চিন্তির ব্যাপার! শ্রীমান অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় সেই ছোটবেলা থেকে যা-যা করেছে, যা-যা ভেবেছে তা যদি ভদ্রলোকের নোটবইতে লেখা থাকে তাহলে আমার দফা রফা। কারণ, পেটমোটা পাগড়ীবাঁধা অসৎ ব্যবসায়ীদের মতো আমি দুটো হিসেবের খাতা রাখি। দেখছেন না আমার মুখ কেমন সরল, কেমন বোকা, কেমন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। অথচ আমার আর একটা রূপ আছে। সেইটাই আমার আসল হিসাবের খাতা।

আমার এক নম্বর মুখোশ দিয়েই তো বেণীমাধব রায়কে জয় করেছিলাম। বেণীমাধব রায় আমাকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। প্রথমে মোটা চশমার কাঁচের মধ্য দিয়ে এবং পরে চশমাটা খুলে নিয়ে খালি চোখে আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন। বলেছিলেন, "ঠিক যেন হারাণবাবু স্বয়ং। ছোটবেলায় আমরা ওঁকে তোমার মতো বয়সেই দেখেছিলাম।"

বেণীমাধব এই এতদিনেও হারাণচন্দ্রের কোন কিছুই বিস্মৃত হননি। বললেন, "সেই মুখ, সেই চুল, সেই নাক, সেই চোখ।" আমার পিঠে একটা আলগা চাপড় দিয়ে বললেন, "হারাণবাবু স্যরকে আর একবার দেখার খুব ইচ্ছে ছিল, ঈশ্বর তোমাকে আমেরিকায় পাঠিয়ে সেই সাধ পূর্ণ করলেন।"

আমি কিন্তু কোনো কথাই বলিনি। এমনভাবে চুপ করেছিলাম যেন সত্যিই হারাণচন্দ্র শাস্ত্রীর দ্বিতীয় সংস্করণ এই আমেরিকায় হাজির হয়েছে। অথচ মনে মনে বুঝছি, হারাণচন্দ্রের খোলটা ছাড়া আর কিছুই নেই আমার সঙ্গে। হারাণচন্দ্রকে অন্য কোথাও বেঁধে রেখে যেন ওর চামড়া পরে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি।

সেই ছোটবেলা থেকেই আমি বেণীমাধবের নাম শুনছি। রাজবল্লভ সাহা সেকেণ্ড বাই লেন থেকে বেরিয়ে বাজারে আসতে ডান দিকে পাঁচিল দেওয়া একতলা বাড়িটা পড়তো। কতদিন রঙ লাগেনি বাড়িটার গায়ে—ভিতরে কারা একটা ছাপাখানা বসিয়েছে। দিনরাত ঘটাংঘট করে ট্রেডল মেশিনে বিল বই, হ্যাণ্ডবিল এবং ফর্ম ছাপানো হচ্ছে। ওই ভাঙা বাড়িটাতেই যে বেণীমাধবের মতো প্রতিভাবান ছেলে জন্মেছে একথা বাবা প্রায়ই আমাকে বলতেন।

রাজবল্লভ সাহা লেনের ছেলে আমরা রকের ওপর আড্ডা বসাতাম, গুলি খেলতাম, লুকিয়ে বিড়ি ফুঁকতাম, আর বলতাম, আমরা কোনোদিনই বিখ্যাত হতে পারবো না। মহৎ পরিবেশ না হলে মহৎ লোকের জন্ম হয় না। ওইতো পার্টি ওয়ার্কার জীতেনদা সেদিন বলে গেল—প্রতিভা-ট্রতিভা ওসব বাজে কথা। সবাই সমান প্রতিভা নিয়ে জন্মেছে—সমাজের কাজ হলো সবাইকে বিকশিত করা। সমাজ তা করে না, শুধু নিজেদের শ্রেণীর লোকের ডিমে তা দেয়। সব ডিম ফুটলে সমাজের কর্তাদের অবস্থা যে কাহিল হয়ে যাবে। বড় লোকের ব্যাগার খাটবে কারা? গরীবরা না থাকলে বড়লোকদের একদিনও চলবে না।

সেই ছোটবেলা থেকেই ইস্কুলের মাস্টারমশায়রাও বেণীমাধবের কথা গর্বের সঙ্গে স্মরণ করতেন। বলতেন, "জানো, ওই বাড়িতেই বেণীমাধব কী কষ্টে লেখাপড়া শিখেছেন।" ইস্কুলের ম্যাগাজিনেও লেখা বেরিয়েছে বিশ্ববিজয়ী বৈজ্ঞানিক বেণীমাধব রায়: "আমরা পরম পরিতৃপ্তির সহিত জানাইতেছি যে, আমাদের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীবেণীমাধব

রায় সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক মহলে বিশেষভাবে সম্মানিত হইয়াছেন। নিউটন বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবকোষের রহস্য সম্পর্কে তাঁহার গবেষণা বৈজ্ঞানিক মহলে নূতন সম্ভাবনার দ্বার খুলিয়া দিয়াছে।"

আমাদের নিরাপদদা তখন মস্ত কবি। আমরা আশা করেছিলাম, ক্লাশ নাইনের ছাত্র নিরাপদদা একদিন রবিঠাকুরকেও ছাড়িয়ে যাবে। আমাদের ক্লাশের দুটো ছেলে তো নিরাপদদার কবিতার দু' একটা পাণ্ডুলিপি আদায় করে নিয়েছিল। নিরাপদদা বিখ্যাত হলে তখন এগুলো চড়া দামে বিক্রি হবে। তাছাড়া পূজাসংখ্যায় বেরুবে 'কবি নিরাপদ দাশের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি। শ্রীনীলরতন হাজরার সৌজন্যে প্রাপ্ত।' সেই নিরাপদদা এখন হাওড়া রেলওয়ে গুডস্ শেডের পাশে টিকিট ছাপাখানার অ্যাসিসটেন্ট প্রুফ রীডার হয়েছে। যেরকম নিষ্ঠার সঙ্গে নিরাপদদা প্রুফ দেখে, এবং দিনরাত অফিসের কথা ভাবে, তাতে নিরাপদদা হয়তো রিটায়ার করবার দু' তিন বছর আগেই আড়াই শ' টাকা পেয়ে যাবে। সেই নিরাপদদাই তো সাহিত্যসভায় সেবার বেণীমাধবের ওপরে রচনা পাঠ করলে। একটা লাইন এখনও আমার মনে রয়েছে: 'বাঙালী এতদিন শুধু গানের রাজা ছিল। বেণীমাধব প্রমাণ করলেন, বাঙালী এখন থেকে জ্ঞানের রাজা, বাঙালী নহে খর্ব।'

আমি অতশত মাথা ঘামাতাম না। কোথায় কোন এক প্রাক্তন ছাত্র কেষ্টবিষ্টু হয়েছে, তাতে আমার কী? আমাকে তো ছাই এই পড়াশোনার বোঝা মোষের গাড়ির মতো টেনে বেড়াতে হবে। আসলে ছোটবেলা থেকেই আমার নিজের সুখ ছাড়া অন্য কিছু সম্বন্ধে আগ্রহ ছিল না।

কিন্তু বেণীমাধবের কথা বলতে গিয়ে বাবার চোখ সজল হয়ে উঠতো। বাবা আমাকে নিয়ে পড়াতে বসতেন, আর বলতেন "ভুলে যাস না, এই আমাদের তিনখানা বাড়ির পরেই বেণীমাধবের মতো ছাত্র থাকতো। তোর বুদ্ধি আছে, তুইও যদি মন দিয়ে পড়িস, যদি তোর বোধোদয় হয়,

তাহলে তুইও অমন বিখ্যাত হবি। তোদের কাজে কর্মে এই রাজবল্লভ সাহা সেকেণ্ড বাই লেনও বিশ্ববিখ্যাত হয়ে যাবে।"

বাবার সেইসব কথা ভাবলে এখন হাসি লাগে। অনির্বাণ চাটুজ্যের কল্যাণে রাজবল্লভ সাহা সেকেণ্ড বাই লেনের কুখ্যাতি ছড়াতে পারতো। কিন্তু বাবার কথা ভেবেই কোনো মেয়ের কাছে রাজবল্লভ সাহা সেকেণ্ড বাই লেনের নাম করি না। সেই সেবার যখন লক্ষ্মীরানী বলে একটা মেয়ের খপ্পরে পড়েছিলাম। বিছানায় শুয়ে লেপটাকে বুক পর্যন্ত টেনে দিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "কোথায় থাকো?" বিছানায় শুয়ে মিথ্যে কথা বলতে আমার মোটেই ইচ্ছে করে না, হাজার হোক পবিত্র স্থান। তবু বাধ্য হয়ে আমাকে বলতে হয়েছিল, "ঠনঠনে।" রাজবল্লভ সাহা লেনকে ছোট হতে দিইনি।

আমাদের ছোট বেলায় প্রায় সবলোকই বিনা প্ররোচনায় জ্ঞান বিতরণের চেষ্টা করতো। বাড়িতে, রাস্তায়, বই-এর পাতায় পাতায়, ইস্কুলের দেওয়ালে দেওয়ালে শুধু উপদেশ আর জ্ঞান। আর বাবা বোধোদয় থেকে পড়াতেন, 'মানুষ শৈশবকালে অতি অজ্ঞ থাকে। ক্রমে ক্রমে যত বড় হয়, উপদেশ পাইয়া, নানা বিষয়ে শিখিতে আরম্ভ করে।'

বুঝুন, আমাদের মতো মানুষের জীবনে ঠিক তার উল্টো। শৈশব-কালেই বোধ হয় একমাত্র পবিত্র ছিলাম: তারপর যত বড় হয়েছি, ততো উপদেশ, ততো জ্ঞান পেয়ে পেকে উঠেছি—পচে গেছি।

কতলোক যে শুধু জ্ঞান দিতে চায় কী বলবো। এদিকে বইতে বলেছে. "যাহারা বিদ্যাভ্যাসে আলস্য ও অবহেলা করিয়া, কেবল খেলিয়া বেড়ায়, তাহারা মূর্খ হয় ও যাবজ্জীবন দুঃখ পায়।" তা যদি হতো তাহলে আমাদের গলির সোনারাম কালোয়ার অত সুখে আছে কী করে? সোনারাম কোনোরকমে সই করে, সোনারামের ছেলেটাও পড়াশোনার মাথায় ঝাড়ু মেরে গলায় সোনার হার পরে ঘুরে বেড়ায়।

"যাহারা বাল্যকালে যত্নপূর্বক বিদ্যাভ্যাস করে, তাহারা কেমন

'মনের সুখে কাল যাপন' করে তা তো আমাদের হ্যাপাদাকে দেখেই বুঝছি। হ্যাপাদা ম্যাট্রিকে জলপানি পেয়েছিল; এখন পায়রা-বুক নিয়ে আমাদের ইস্কুলে ছেলে ঠেঙাচ্ছে। বাড়িতে জল নেই, হ্যাপাদাকে রোজ রাস্তার কলে এসে লাইন মারতে হয়।

বাবা দিনরাত ঠাকুর ভজছেন, চোখ বুজে আধঘণ্টা ধরে সন্ধ্যাহ্নিক করছেন। আর ওদিকে আমাদের পাড়া থেকে একটু এগিয়ে গিয়েই মহাপ্রাণ হিমাংশু শর্মা হাঁপানিবজ্র ও স্ত্রী-সখা বিক্রী করে তিনতলা বাড়ি তুলছে।

মহাপ্রাণ হিমাংশু শর্মার বাবা জ্ঞানাংশুবাবু স্বপ্নে হাঁপানিবজ্র পেয়েছিলেন। জীবের মঙ্গলের জন্য সেই ওষুধ বিনামূল্যে বিতরণ করেন, কোনোপ্রকার মূল্য নেওয়াকে মহাপাপ মনে করেন। শুধু দেবীর পূজা ও দরিদ্রনারায়ণ সেবার জন্য দশ টাকা দশ আনা আদায় করেন। তারপর হিমাংশু শর্মা শুধু হাঁপানির ওপর নির্ভর করা নিরাপদ নয় মনে করে স্ত্রী-সখা বার করলেন। প্রত্যেক ইলেকট্রিক ল্যাম্প-পোস্টে, পাঁজিতে, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন। একদিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি, একটা আট বছরের ছেলে আমার হাতে 'স্ত্রী-সখা'র হ্যাণ্ডবিল দিয়ে গেল। হ্যাণ্ডবিল পড়ে কিছুই বুঝতে পারলাম না। বাবাকে জিজ্ঞেস করতে গেলাম, "বাবা ঋতুবন্ধ কী?"

বাবার গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর হয়ে উঠলো। বললেন, "কেন জিজ্ঞেস করছো?"

ভয়ে ভয়ে কাগজটা দেখালাম। বাবা কাগজটা আমার হাত থেকে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে বললেন, "নিজের পড়ায় মন দাও।"

পরের দিন হিমাংশু শর্মার ছেলে, আমাদের সহপাঠী মণ্টাকে ব্যাপারটা বললাম। মণ্টা তো মাথায় হাত দিয়ে বসলো। "তুই করেছিস কী? পণ্ডিত মশাইকে জিজ্ঞেস করতে গেছিস! ছেলে হলে যাদের কেলেঙ্কারী হবে তারাই স্ত্রী-সখা কিনতে আসে।

সোজাসুজি লিখলে পুলিসে ধরবে, তাই ওইরকম কোডে লিখতে হয়।"

"ছেলে হলে লজ্জা কী?" আমি বোকার মতো জিজ্ঞেস করেছিলাম।

মণ্টা বলেছিল, "আরও একটু মস্তান হ, তখন বুঝবি।"

মণ্টা ছিল একটু বোকা বোকা। আমি বলতাম, "তোর দাছু, তোর বাবা কেমন স্বপ্নে ভাল ওষুধ পেয়ে যায়। তাই তোরা বড়লোক হয়ে গেলি। আমি ভাই স্বপ্নে এতো চেষ্টা করি, কিন্তু কিছুই পাই না। একবার শুধু দেখলাম, নির্জন পথ ধরে হাঁটছি, আপন মনে হাঁটছি তো হাঁটছি। হঠাৎ নজরে পড়ে গেল রাস্তার ওপর কী একটা চক চক করছে, গিনির মতো। ও-মা, নিচু হয়ে দেখি একটা তামার পয়সা। তাও যেমনি তুলতে গেলাম, কোথায় হারিয়ে গেল। আর ঘুমটাও ভেঙে গেল সঙ্গে সঙ্গে।"

মণ্টা বললে, "কাউকে বলিস না ভাই, স্বপ্ন-ফপ্ন সব মিথ্যে। দাছু আর বাবা বুদ্ধি খাটিয়ে খেটেখুটে ওইসব ওষুধ বার করেছে। দাছু সেদিন বাবাকে কী বলছিল জানিস। দাছু বলছিল, ইণ্ডিয়াতে উনচল্লিশ কোটি লোক রয়েছে, তাদের সবাইকে দু' আনা করে ঠকাতে পারলেই এত টাকা হবে যে রাখতে পারবে না। আর সবটা নিজে খাবি না, দু'চার পয়সা বাইরের লোকদের দিবি। নুন না খেলে, তারা গুণ গাইবে কেন? আর যত গুণকীর্তন হবে লক্ষ্মী ততো দয়া করবেন।"

সেই মণ্টাই এখন কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেকটর হয়েছে! আমাকে একটা চিঠিও লিখেছিল আমেরিকায়—যদি বেণীমাধবের কাছ থেকে ওর নতুন মাদুলির জন্যে একটা সার্টিফিকেট আদায় করতে পারি। মাদুলি রপ্তানি করে এখন ফরেন এক্সচেঞ্জ রোজগারের চেষ্টা করছে। আমি সাহায্য করলে মোটা কমিশন দেবে।

বাবা আমাকে যা শেখাতে চাইতেন, তার কিছুই আমার মাথায় ঢুকতো না। তবে বাবা আমাকে বোধোদয়টা মুখস্থ করিয়ে ছেড়েছিলেন। ওর সমস্ত নীতিবাক্য আমি এক নিঃশ্বাসে বলে যেতে

পারি। আরও বয়স বেড়েছে, আরও কত বই এনে দিয়েছেন বাবা। কিন্তু কিছুই আমাকে নরম করতে পারেনি। আমার মাথায় কেন জানি না শুধু ঘোরে বোধোদয়ের সেই কথা : "ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। ইন্দ্রিয় না থাকিলে আমরা কোনো বিষয়ে কিছুই জানিতে পারিতাম না।"

বাবা পই পই করে পঞ্চেন্দ্রিয়ের কথা মনে রাখতে বলতেন, "চক্ষু দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে দর্শন বলে ; কর্ণ দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে শ্রবণ ; নাসিকা দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে আঘ্রাণ ; জিহ্বা দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে আস্বাদন ; ত্বক দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে স্পর্শ বলে।"

এখন আমার হাসি লাগে। বাবা জিজ্ঞেস করতেন, "অভিজ্ঞতা কীরূপে জন্মায় ?"

আমি চটপট বলেছিলাম, "ইন্দ্রিয়ের বিনিয়োগ দ্বারা।"

আমি শান্ত সুবোধ বালকের মত বসে থাকতাম, ছেলের মুখ দেখে জন্মদাতা পিতাও বুঝতে পারতেন না, ছোকরার মনে কী আছে।

যত বড় হয়েছি, আমি ততই বুঝে নিয়েছি, ইন্দ্রিয়ই সব। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সব আগুনই তো একদিন ফিউজ হয়ে যাবে, তখন পাড়ার ছোঁড়ারা আমার এই দেহটাকে খাটিয়ায় শুইয়ে ঘাটে নিয়ে যাবে, শুধু শুধু পিতৃদেব অনির্বাণ নাম দিয়ে হাঙ্গামা বাধাতে গেলেন।

এ সব নিয়েও শেষে আমি মাথা ঘামাতাম না। নাম তো প্রপার নাউন—কানা ছেলেকেও পদ্মলোচন বললে ব্যাকরণ ভুল হয় না।

আমার এই আস্তে আস্তে বড় হয়ে ওঠা, আস্তে আস্তে দুনিয়ার রহস্যটুকু বুঝে ফেলার ব্যাপারগুলো যদি বলতে আরম্ভ করি, সে আর এক মহাভারত হয়ে যাবে। দুনিয়াতে সব বেটাই সাধু হয়ে বসে আছে। যদি এই ভড়ংটুকু ধরতে না পার, তা হলে মরলে তুমি। নিজের এতবড় চরকা রয়েছে, সেখানে তেল লাগাও। যতটা পার ম্যাসেজ করে, ধারে খাও।

আমার একটা সুবিধে হয়েছিল। দেহ সম্বন্ধে তেমন কিছু জানতাম না। মণ্টাদের বাড়িতে প্রায় যেতাম। মণ্টার এক মাসতুতো বোন একবার বেড়াতে এসেছিল। একদিন তার সঙ্গে দেখা হলো। দার্জিলিঙের কোন্ কনভেন্টে পড়ে।

মণ্টাই বললে, "শিপ্রা, তোর ইংরিজী শোনাবার জন্যে আমার বন্ধুকে নিয়ে এসেছি।"

শিপ্রার তখন বয়ঃসন্ধি। কালোর ওপর বেশ চেহারাটি। চোখ দুটোও হরিণের মত। আমার কাছে তখন চোখই প্রধান আকর্ষণ—চোখই যে এক নম্বর ইন্দ্রিয়। শিপ্রা বলল, "আমি কি চিড়িয়াখানার কাকাতুয়া যে আমার ইংরিজী শোনাবার জন্যে ওকে নিয়ে এসেছ?"

আমি লজ্জা পেয়ে বললাম, "ইংরিজীতে কথা শুনতে আমার খুব ভাল লাগে। আমরা দিশী ইস্কুলের ছেলে তো, ইংরিজী তেমন উচ্চারণ করতে পারি না।"

কাকাতুয়া ঠোঁট উল্টে বললে, "আমার ভাল লাগে বাংলা। আসুন, আপনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বাংলায় কথা বলি। জানেন, দার্জিলিঙে বাংলা কথা না বলতে পেরে আমি হাঁপিয়ে উঠি।"

মণ্টা আমাদের খাবার আনবার জন্যে মাকে বলতে চলে গিয়েছিল। সেই সময় আমি বোকার মত বলে ফেলেছিলাম, "রবীন্দ্রনাথকে আমার ভাল লাগে। কিন্তু তার থেকে অনেক বেশী ভাল লাগে সায়েবদের। রামকেষ্টপুর ঘাটে একজন মেমসায়েবকে হিট হিট প্রিং প্রিং করে ইংরিজী বলতে শুনেছিলাম, কী সুন্দর যে লেগেছিল!"

শিপ্রা আমার মুখের দিকে ওর চোখের সার্চলাইট ফেলে তাকিয়ে রইল। তারপর ফিক ফিক করে হাসতে লাগল। বললে, "অতই যখন ইংরিজী শোনার শখ, তখন একটা মেমসায়েব বিয়ে করবেন।"

যাচ্ছাই! এর মধ্যে আবার বিয়ের কথা এসে গেল কেন? শিপ্রার ওপর রাগ হয়ে গেল। ইংরিজী জান, শোনাবে না বললেই হয়। দার্জিলিঙের জন্যে সব ইংরিজী জমিয়ে রাখ। আমার এমন রাগ হয়ে গেল যে, মণ্টার জন্যে অপেক্ষা না করেই চলে এসেছিলাম।

পরের দিন মণ্টা বললে, "কি ব্যাপার তোর? বলা নেই কওয়া নেই চলে এলি?"

আমি গুম হয়ে রইলাম। মণ্টা বললে, "অনেক ভাগ্য করে এসেছিস ভাই।"

"মানে?"

"শিপ্রা বলছিল, তুই খুব সুন্দর। তোর চুলগুলো কেমন কোঁকড়া, তোর গায়ের রঙ সায়েবদের মতন। আসলে তোর বেশ ধারালো চেহারা।"

মণ্টার রিপোর্ট শুনে আমার সমস্ত শরীরটার মধ্যে কেমন একটা নতুন অনুভূতির বিদ্যুৎ তরঙ্গ বয়ে গেল, যা এর আগে কখনও অনুভব করিনি।

মণ্টা আমার দেহের অবস্থা বুঝতে পারলে না। কিন্তু আমার হঠাৎ চলে আসায় সে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছে। সে বললে, "হাঁরে, শিপ্রা তোকে কী বলেছে? নিশ্চয় অপমান করেছে। আমার সোজা কথা, বন্ধুর প্রেস্টিজ আগে। মাসতুতো বোন বলে ছেড়ে কথা বলব না।"

আমি বললাম, "তুই ওকে জিজ্ঞেস করলি না কেন?"

"করেছিলাম! কিছুই বলল না! শুধু বললে, ব্যাটাছেলের অতো

রূপের দম্ভ ভাল না। তুই যে মাইরি এতো সুন্দর, এটা আমার কখনও খেয়াল হয়নি। এখন শিপ্রার কথা শুনে মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা সত্যি। আর একটু বয়স বাড়লে তোর যা বিপদ হবে!"

"কীসের বিপদ?" আমি ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করি।

মণ্টা একটু রসের সঙ্গে বললে, "মজার বিপদ। যখন মেয়েদের পাল্লায় পড়বি তখন বুঝবি!"

এর পর শিপ্রার সঙ্গে দেখা করতে না যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

আমাকে দেখে শিপ্রা বললে, "এসেছেন তা হলে। যা ভয় পেয়েছিলাম, হয়তো আর দেখাই হবে না। আমি আর ক'দিন এখানে আছি? ইস্কুল খুলে এল বলে।"

আমি বললাম, "আমার যাকে খুশী আমি বিয়ে করব।" তারপরই মাথাটা গুলিয়ে গিয়েছিল। কথায় বলে, রাগ না চণ্ডাল। হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "আমি মেমসায়েবই বিয়ে করি আর তোমাকেই বিয়ে কবি, তাতে তোমার কী?"

মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে যেতেই চমকে উঠলাম। ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরেছিলাম, কিন্তু তার আগেই মুখ থেকে কথা বেরিয়ে গিয়েছে। ভেবেছিলাম, কেলেঙ্কারি হবে। ঠিক সেই সময়ে মণ্টা আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ভাবলাম এখনই শিপ্রা ফেটে পড়বে রাগে, কান্নাকাটি বাধিয়ে আমাকে ফ্যাসাদে ফেলে দেবে।

কিন্তু শিপ্রা আমাকে অন্তত মণ্টার সামনে রক্ষা করে দিল। চুপচাপ রইল। মণ্টাকে বললাম, "আমার একটু কাজ আছে ভাই, এখন চলি।"

তারপর দু'দিন ছুটি ছিল। মণ্টার সঙ্গে দেখা হয়নি, ওদের বাড়িতে যেতেও সাহস করিনি। ব্যাপারটা এতক্ষণে কতটা ছড়িয়ে পড়েছে কে জানে।

ছুটির পরের দিন ইস্কুলে মণ্টাকে দূর থেকে দেখলাম। কিন্তু কাছে

যেতে সাহস হচ্ছিল না।

মণ্টা নিজেই আমার কাছে এসে বললে, "কী রে, দু'দিন তোর দেখা নেই। শিপ্রা আমার কাছে তোর খবর করছিল।"

তারপর কী যে হয়েছিল, আবার যেতে শুরু করেছিলাম মণ্টাদের বাড়িতে। শিপ্রা যেন সেদিনকার ঘটনাটা বেমালুম ভুলে গিয়েছে। আমার হঠাৎ মনে হলো, শিপ্রা যে এত সুন্দর তা আগে কখনও আমার নজরে পড়েনি। এতদিন যে কুঁড়ির আকারে গাছের পাতার মধ্যে শিপ্রা লুকিয়েছিল। আর এই একদিনেই হঠাৎ সে ফুটে উঠেছে।

আদুরে গলায় শিপ্রা বলে, "জানো মণ্টাদা, আমি খুব ডানপিটে। দৌড়ে, পাহাড়ে ওঠায়, সাঁতার কাটায়, ভলিবলে কেউ আমার সঙ্গে পেরে ওঠে না।"

মণ্টা বলে, "তুই বাজে বকিস না।"

শিপ্রা বলে, "আমাদের যে ফুটবল খেলতে দেয় না। তোমাদের বয়েজ স্পোর্টিং-এ একদিন চান্স দাও না, দেখ কী রকম খেলি।"

মণ্টাই আমাদের বয়েজ স্পোর্টিং-এর সর্বেসর্বা। আমার ক্ষমতা থাকলে বেচারা শিপ্রাকে একটা সুযোগ দিতাম। কিন্তু দলপতি মণ্টার মন গললো না। তার বক্তব্য : মেয়েরা আবার ফুটবল খেলবে কি?

যত দিন যাচ্ছে, যত শিপ্রার দিকে তাকাচ্ছি, শিপ্রা ততই সুন্দর হয়ে উঠছে। আমার ততই ভয় বাড়ছিল। ছোটবেলা থেকেই আমার এই স্বভাব। সুন্দর কোনো জিনিস দেখলে আমার হাত নিসপিস করে। সুন্দর খেলনা দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে নিয়ে নিয়েছি, তার পরেই টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলেছি।

তারপরেই ব্যাপারটা ঘটলো। সেদিন ছুটির পর ইস্কুলের বাগানে দাঁড়িয়েছিলাম। কী সুন্দর একটা গোলাপ ফুল ফুটেছে। আমি হাত বাড়িয়েছি, এমন সময় কানে গেল "খোকা।"

চমকে পিছন ফিরে দেখি, স্বয়ং পিতৃদেব। বললেন, "ফুল গাছেই

সুন্দর। গাছে ফুল থাকলে কত লোক তাকে দেখতে পাবে। তোমার মত খুশী দূর থেকে দেখ। ফুলকে গাছ থেকে ছিঁড়ে নষ্ট কোরো না।"

তখনকার মত চলে এলাম। কিন্তু চোখ বুজলেই ফুলটাকে দেখতে লাগলাম। মনকে কত বোঝালাম বাবার কথা। ভাল জিনিসকে দূর থেকে দেখতে হয়। আমি ছাড়াও অন্যে দেখে আনন্দ পাবে। কিন্তু মন আমার একগুঁয়ে, আমার কোনো কথাই তার কানে গেল না। যা করবে ঠিক করেছে, তাই করবে।

রবিবার ছিল সেদিন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম ইস্কুলের দিকে। পণ্ডিতমশায়ের ছেলে বলে দারোয়ানরা গেট দিয়ে ঢুকতে দিলে, কিছুই বললে না। সোজা গিয়ে গোলাপ ফুলটাকে হিঁচড়ে গাছ থেকে ছিঁড়ে নিলাম। গাছটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় দুলছে। আমি হিংস্র আনন্দে ফুলটাকে একবার নাকের কাছে নিয়ে গিয়ে প্রাণের সুখে শ্বাস নিলাম। আঃ, কি মিষ্টি গন্ধ!

আবার গন্ধ নিলাম গোলাপটার—কিন্তু এবার গন্ধটা আর তেমন মিষ্টি লাগল না। এমনি সাধারণ গন্ধ।

আর একবার গন্ধটা নিতে গিয়ে মনে পড়ে গেল, ফুলের মধ্যে পোকা থাকে, খুব কাছ থেকে শুঁকতে নেই, নাকে পোকা ঢুকে যায়। তারপর ভাবলাম, ফুলটা পকেটে পুরে ফেলি।

কিন্তু দারোয়ান যদি ধরে ফেলে। পকেটে ফুল পেলে সোজা বাবাকে বলে দেবে। এরপর যে কী হবে তা জানি। দু'এক ঘা মার সহ্য হয়। কিন্তু সুদীর্ঘ বক্তৃতা, বিদ্যেসাগর মশায় থেকে কোটেশন হজম করা কষ্টকর। ভারি চোটের তো একটা ফুল। তার জন্য এত হাঙ্গামা হুজ্জত পোষায় না। তার থেকে ফুলটাকে টবের মধ্যে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে যাই। গোলাপ ফুলের পাপড়ি থেকে অনেক সময় ফুল গাছ হয়েছে শুনেছি।

ওইখান থেকেই সোজা চলে গিয়েছিলাম মন্টাদের বাড়ি। বিরাট

বাড়ির ছাদের এক কোণে শিপ্রাকে পাকড়াও করলাম। "মণ্টা কই?"

"দাদা মাসিমার সঙ্গে কাপড় কিনতে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে গিয়েছে। গাড়ি সঙ্গে আছে, এখনই ফিরবে। বসুন না।" বললে শিপ্রা।

আমার তখন শুধু চটকানো গোলাপ ফুলটার কথা মনে পড়ছে। শিপ্রা বললে, "কী ভাবছেন এতো?"

"শিপ্রা, একটা গোলাপ ফুল দেখলাম, সদ্যফোটা।"

"তাই নাকি, আপনি ফুল ভালবাসেন বুঝি?"

"আমি সব সুন্দর জিনিস ভালবাসি, শিপ্রা। জানো শিপ্রা, গোলাপ ফুলটা···"

"কী হলো, আটকে গেলেন কেন?"

"ফুলটা তোমার মত সুন্দর, তোমার মত মিষ্টি।"

"হা হা! আপনি কবিতা লিখুন, ভাল হবে।"

"ভাবলাম, তোমাকে উপহার দেবার জন্যে গোলাপ ফুলটা তুলে আনি।"

"আনলেন না কেন? খুব মজা হতো। দার্জিলিঙে আমি রোজ একটা করে ফুল চুলে গুঁজে রাখি।" গোলাপ ফুলের মতোই হেসে শিপ্রা কথা বললো। হঠাৎ অনুভব করলাম, একটা তাজ্জব ব্যাপার ঘটছে। আমার চোখের সামনে শিপ্রা নিজেই আস্তে আস্তে একটা তাজা রাঙা টুকটুকে শিশিরে ভেজা গোলাপ ফুল হয়ে যাচ্ছে।

মনের এই অবস্থা মোটেই নিরাপদ নয়। আমি নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছি না। আমি ঢোক গিলে শিপ্রাকে বললাম, "ফুল আনলে, তুমি হয়তো বাড়িতে বলে দিতে।"

ঠোঁট উলটে, অর্থপূর্ণ হাসির ঝিলিক দিয়ে শিপ্রা বললে, "মোটেই না। গোলাপ ফুলের দাম বুঝি।"

শিপ্রার মুখে সারল্যের ছাপ আমাকে অভিভূত করছিল। আমি শিপ্রার কাছে সব বলতে যাচ্ছিলাম: "জানো শিপ্রা, আমি আনতে

গেলাম।" কিন্তু শেষ মুহূর্তে আমার সংসারী বুদ্ধি প্রবল হয়ে উঠলো। আমার মন বেঁকে বসলো, কিছুতেই আমাকে সত্যি কথা বলতে দিল না। আমি থমকে দাঁড়িয়ে মনের কাছে কাকুতি মিনতি করলাম, হাজার হোক একটা ফুলের মত সরল মেয়ে। ওকে মিথ্যে কথাটা নাই বা বললাম। কিন্তু শালা মন একটুও নড়লে না।

অগত্যা বললাম, "শিপ্রা, গোলাপটা তুলতে গিয়েও ছিঁড়তে পারলাম না। বড় মায়া হলো। গাছেই ফুল ভাল দেখায়। দেখোনি বোটানিক্যাল গার্ডেনে লেখা আছে, ফুল তুলিবেন না।"

শিপ্রা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। ও বোধ হয় আমার কবিমনকে শ্রদ্ধা করতে আরম্ভ করেছে। বললাম, "ফুলটা তোমাকে দেবার খুব ইচ্ছা হয়েছিল। শেষে খালি হাতে চলে এলাম, তোমার কাছে দোষ স্বীকার করতে।"

শিপ্রার টানা-টানা কিশোরী চোখগুলো তখন অনুরাগে ছলছল করছে। বললে, "দোষ কী? আপনি যে আমার কথা ভেবেছেন এটাই যথেষ্ট।"

শিপ্রার কথা শুনতে শুনতে মনে হলো, শিপ্রার মুখটা আবার গোলাপ ফুলের আকার নিচ্ছে। আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। সংযমের শিকল ছিঁড়ে তীব্র বেগে ছুটে গিয়ে আমি হঠাৎ শিপ্রাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলাম। তারপর কোনো রকম চিন্তা না করেই শিপ্রাকে চুম্বন করেছি।

সজ্ঞানে জীবনের সেই প্রথম উত্তপ্ত চুম্বন। আমি শিপ্রার ওষ্ঠের স্বাদ ও স্পর্শ দুই একসঙ্গে অনুভব করলাম। তারপর অকস্মাৎ সংবিৎ ফিরে এল। আমি তাড়াতাড়ি মুখ সরিয়ে নিয়েছি। আমি আবিষ্কার করলাম, উত্তেজনায় আমার সমস্ত শরীর ঘেমে উঠেছে। শিপ্রার দিকে তাকাতে পর্যন্ত আমার সাহস হচ্ছিল না। সে এবার কী করে বসবে কে জানে।

কিন্তু শিপ্রা সেদিন আমাকে রক্ষা করলে। সস্নেহ কণ্ঠে মৃদু বকুনি দিয়ে বললে, "এখনই কে দেখে ফেলবে।" তারপর আমার দিকে তাকিয়ে শিপ্রা পরম বিশ্বাসের সঙ্গে বললে, "আপনি যে গোলাপ ফুলটা ছেঁড়েননি, এর জন্যে আমি খুব খুশী হয়েছি। ওটা ছিঁড়লে আপনাকে আমি এমনভাবে ভালবাসতে পারতাম না।"

এসব কী বলছে শিপ্রা। এতক্ষণ এ-সি কারেণ্টে হাত দিয়ে বসেছিলাম। আমাকে ক্রমশই কেন্দ্রবিন্দুর দিকে টানছিল বিদ্যুৎ। হঠাৎ সুইচ টিপে কেউ এ-সিকে ডি-সি করে দিল। আমি ছুটকে পড়ছি। শিপ্রা থেকে আমি অনেক দূরে ছিটকে পড়ছি। ওর কথা শোনার পর আর একটুও ভাল লাগছে না শিপ্রাকে।

সম্ভব হলে তখনই চলে আসতাম। কিন্তু প্রেমের লেজারে এই প্রথম নাম লেখালেও সংসারের হিসেবে বেশ পোক্ত হয়ে উঠেছি। এখন আচমকা চলে এলে অসুবিধা হবে বুঝতে পেরে, আমি অভিনয় শুরু করলাম। নিরীহ গোরুর মতো চোখ দিয়ে ওর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। নাটক আর গড়াল না, মণ্টা বাড়ি ফিরে এসেছে।

মণ্টাদের বাড়ীতে শিপ্রা থাকতে আর যাইনি। মণ্টা বলেছিল, "আমার বোন চলে যাচ্ছে, তোকে বার বার করে যেতে বলেছে।"

আমি কিন্তু ওদিকে পা বাড়াইনি। শিপ্রাতে আমার সব আগ্রহ শেষ হয়ে গিয়েছে।

শিপ্রা আমাকে একটি চিঠি লিখেছিল, তাতে সেই গোলাপ ফুলটার কথা ছিল। আমার সৌন্দর্যের কথাও লিখেছিল শিপ্রা। সুতরাং বুঝতে পারছি, শিপ্রার কাছে শুধু নিইনি, আমার কাছ থেকে সেও পেয়েছে। সুতরাং চিন্তা করার কিছু নেই—আমি চিঠিটা টুকরো টুকরো করে ফেলেছি।

এমনি করেই বড় হয়ে উঠছি। বাবা অহরহ আমার মধ্যে মহাপুরুষ

সৃষ্টির স্বপ্ন দেখেছেন। মা চুপচাপ থাকেন। মাঝে মাঝে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করেন। আমাকে আদর করে বলেন, "আমার গা ছুঁয়ে বল, তুই বাপের মনে কষ্ট দিবি না।"

আমি বেমালুম মায়ের গা ছুঁয়ে যা বলবার বলেছি। আমি ওসব ফকিবাজীতে বিশ্বাস করি না। হাজার হোক জননী আমার মিসেস হারাণচন্দ্র, সুতরাং তিনি তো স্বামীর দিকেই ঝোল টানবেন।

মিথ্যে কথা বলছি সন্দেহ করলেই, মা ঠাকুর ঘরে নিয়ে যেতেন। বলতেন, "ঠাকুরের সামনে ঠিক করে বল।" আমি বেমালুম বলে যেতাম। মিথ্যে কথা বললে, পরের জিনিস না বলে নিলে, গুরুজনকে মান্য না করলে কী অপরাধ হয়, আমি বুঝতে পারতাম না। এখনও বুঝি না।

কপাল গুণে বুদ্ধিটা মন্দ ছিল না। পড়তে বসলে মাথায় ঢুকতো। কিন্তু আমাদের এই সামান্য কিছুক্ষণের জীবনে কত কী দেখার, করার এবং উপভোগের আছে। তার জন্যে সময় লাগে। তাই লেখাপড়াটা দায়সারা ভাবে চালাতে হয়েছে।

বাবা তখনও আশা ছাড়েননি। নিজে পড়াশুনায় ডুবে থাকতেন, বাকি সময় লোকের উপকার করতেন। ম্যাট্রিক পেরিয়ে তখন কলেজে ঢুকেছি। বাবা তখনও সেই একই জ্ঞান মাথায় ঢোকাবার চেষ্টা করছেন, "দেখ, লেখাপড়ায় ভাল হওয়াটাই শুধু শিক্ষা নয়। সেই হলো শিক্ষা যা মানুষকে মানুষ করে তোলে।"

এরপরও যদি চুপ করে থাকি, বাবা কোটেশন দেবেন। "প্রাণীর অপর নাম জন্তু···সমাজে ভালমন্দ নানাবিধ লোক বাস করে। একদিকে জ্ঞানী ও ধার্মিক লোকেরা সুশিক্ষা ও সুপরামর্শ দ্বারা, সকলকেই সৎপথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন। অপরদিকে চোর, ডাকাত, প্রবঞ্চক প্রভৃতি দুশ্চরিত্র ব্যক্তিগণ পরের দ্রব্য অপহরণ করিয়া

তাহাদের সর্বনাশ করিবার চেষ্টা করে।”

এ-সব আমাকে বলবার দরকার নেই, এসব আমার মুখস্থ। বাবা সমস্ত বোধোদয়টা গুলে আমার কানের মধ্যে দিয়েছিলেন।

কলেজে ঢুকে দেখলুম অনেকে নিজের কথা ছাড়াও দেশের কথা ভাবে। রেস্তোরাঁয় চপ কাটলেট ওড়াতে ওড়াতে দুশ্চিন্তা করে গরীবদের কী হবে!

আমার কিন্তু নিজেকে ছাড়া আর কিছু নিয়ে চিন্তা নেই। পিতৃদেবকে শ্রদ্ধা দেখাতে হয় টাকার জন্যে। আর মাকে মাঝে মাছে আবদারে ভিজিয়ে রাখতে হয়। পায়ে হাত দিয়ে বলতে হয়, “বিশ্বাস করো, লেখাপড়া ছাড়া আর কিছুতেই মন নেই আমার।”

এই সব না বললে বিড়ি-সিগারেট কেনার খরচ এবং বালিকা-বন্ধু নিয়ে সিনেমা যাবার পয়সা মা'র কাছ থেকে বার করা যায় না। মাকে অবশ্য বলি, “কলেজের পুওর ফাণ্ডে কিছু চাঁদা দিতেই হবে মা। পয়সার অভাবে অনেক ছেলে বই কিনতে পারছে না।”

মা'র চোখ ছলছল করে উঠতো। বলতেন, “আহা বেচারা। বই না থাকলে কী করে পরীক্ষায় বসবে?”

ছেলের মহৎ হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে মা যে চাপা গর্ব অনুভব করছেন তাও বুঝতে পারতাম।

তারপর টাকা নিয়ে একটু ফূর্তি হতো। কয়েকজন মিলে এই ভাবেই প্রথম মদের দোকানে গিয়েছি। প্রথমে একটু ভয় ভয় করছিল। কলেজের ছোকরা দেখলে যদি না ঢুকতে দেয়। কিন্তু দেখলাম ম্যাটিনী টাইমে ছেলে-ছোকরার সেবা করতে ওরা অভ্যস্ত।

অভ্যাস না থাকায় একটুতেই আমাদের বেশ রঙ চড়ে গিয়েছিল। শ্যামল সেন বললে, “কী রে অনির্বাণ, অত কী ভাবছিস?”

সুন্দর মিত্তির উত্তর দিলে, “ভাবছে ফার্স্ট ইয়ারেই মাল ধরলে—

সিকসথ্ ইয়ারে তাহলে কি চড়াবে!"

শ্যামল সেন অভিজ্ঞ ছোকরা। বললে, "কিসসু ভেবো না চাঁদ, উচ্ছন্নে যাবার বহু জিনিস এখনও পড়ে রয়েছে। এটা তো হাতেখড়ি।"

আমি আর পারলাম না। বললাম, "গান্ধী বলেছেন না, উদ্দেশ্য মহৎ হলেই চলবে না; পথটাও সৎ হওয়া চাই।"

শ্যামল বললে, "উনি তো আরও বস্তা বস্তা দামী কথা বলে গিয়েছেন। তাতে কী আসে যায়?"

মদের নেশায় একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম, "নাঃ, ভাবছি গরীব ছেলেদের নাম করে মায়ের কাছে টাকাটা আদায় করলাম।"

"আর হাসাস না মাইরি, যথেষ্ট হয়েছে", শ্যামল বললে। "তোর এখনও হস্তি-দির্ঘী জ্ঞান হলো না। অযথা মন খারাপ করছিস। আরে মূর্খ, গরীবদের নামেই তো সাহায্যের আবেদন করা হয়, চাঁদা তোলা হয়, ট্যাক্সো বসানো হয়। তারপর সেই টাকাতেই নিজের নামে, কেউ সরকারী নামে বাড়ি করে, গাড়ি চড়ে, ফ্যামিলি নিয়ে বিদেশে দেশের প্রতিনিধিত্ব করে, ককটেল পার্টিতে ইণ্ডিয়ান গরীবদের দুঃখের কথা বলে।"

সুন্দর বলেছে, "না মাইরি, আমি গরীবদের জন্যে কিছু করবো।"

নেশা তখন বেশ জমে উঠেছে। আমি বললাম, "কত হাতি গেল তল—মশা বলে কত জল!" শ্যামল বললে, "কত ধম্মপুত্তুরকেই তো দেখলাম! কেবল তুমি বাকি আছো।"

যে যাই বলুক, শুধু নেশা-ভাঙ করে ছাত্রজীবন অতিবাহিত করা যায় না। কিছু ছোঁড়া আমাদের সময় কলেজে দেশ দেশ করতো। আমিও একটু-আধটু জড়িয়েছিলাম—দেশের জন্যে নয়, অনিলার জন্যে। অনিলা মেয়েটা আমাদের ক্লাশের মধ্যে বেশ সুন্দরী। মুখের ছাঁটকাট ভাল, স্বাস্থ্য আছে, রঙ আছে। আর বাবার পয়সা আছে। আবার ডান

গালে ঠোঁটের পাশে একটা কালো বিউটি স্পট আছে। এ-হেন মেয়েটি যে তরুণদের মাথা গরম করে দেবে তাতে আশ্চর্য কী!

অনিলা এমনি মেশে না। কিন্তু রাজনৈতিক কাজ করলে কথা বলে, একসঙ্গে চা খায়। সুতরাং নারী-নেশা আমাকে দেশপ্রেমিক করে তুললো। প্রথম প্রথম মনে একটু খচখচ করতো। হাজার হোক বঙ্কিমচন্দ্র দেশকে জননী বলে গিয়েছেন; এখানে সেক্স নিয়ে যাচ্ছি, আমি মহাপাতক হবো। আমার শুধু ইচ্ছে অনিলার হাতে একবার হাত রাখা, আর ঈশ্বর প্রসন্ন হলে শিপ্রার কাছে যা পেয়েছি তাই অনিলার কাছ থেকে আদায় করা।

বন্ধু-বান্ধবদের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি, ব্যাপারটা এমন কিছু শক্ত নয়। সার সত্যটি হলো, প্রত্যেক মেয়েরই একটি সুইচ থাকে। সেইটা কোথায় জানতে পারলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো।

একদিন এসপ্ল্যানেডে বক্স কালেকশনে বেরিয়েছিলাম আমরা দু'জন। তার আগে অনিলাকে নিয়ে একটা রেস্তোরাঁয় গিয়েছিলাম চা খাবার জন্যে। পায়ের চটিটা খুলে আলতোভাবে অনিলাকে স্পর্শ করেছিলাম। বেশ নরম পা। আমার নাকটাক গরম হতে আরম্ভ করেছে! কিন্তু অনিলার খেয়াল নেই! সে দেশের কথা ভাবছে। বছর তিনেক পার্টি করছে! আমাদের নেতা সুবিনয়দা ঘোড়েল মাল —জানতেন কুনকী হাতী না রাখলে নতুন হাতী ধরা পড়বে না। প্রতিবছর নতুন ছাত্ররা এলেই তাই প্রথমে একটা ছাত্রী জোগাড় করতেন।

অনিলা যখন পায়ের কথা না ভেবে পার্টির কথা বলে চললো তখন একটু লজ্জা হলো। দেশের কথাও তো একটু ভাবা দরকার। দেশের জনসাধারণের কাছে আমাদের সমস্যা তুলে ধরার জন্যেই তো বাক্স করে চাঁদা আদায় করতে বেরিয়েছি আমরা।

অনিলা পরেছিল একটা লালপেড়ে শাড়ি, আর লাল রঙের

হাতা-ওয়ালা ব্লাউজ। কোনরকম সাজগোজ করেনি। আর আমি তো একটা বুশ শার্ট ও ট্রাউজার চড়িয়েছি।

সেইদিনই ইণ্ডিয়ার জনসাধারণকে বুঝে নিয়েছি আমি। যার সামনেই বাক্স নাড়ি সেই আমার গোঁফ দেখেই লর্ডের মেজাজে সামনে এগিয়ে যান। অথচ অনিলার বাক্সে টপাটপ পয়সা পড়ছে।

দু' একজন আবার লেকচার ঝাড়ে। "তোমাদের কোন পার্টি?"

আমাদের পার্টির নাম বলি।

"তা লেখাপড়া না করে রাস্তায় নেমেছ কেন?"

"আজ্ঞে পিপলের কাছ থেকে সহযোগিতা চাই আমরা। পিপলই তো সব শক্তির উৎস। পিপল এক টাকা দিলে তাই আমাদের লক্ষ টাকা। পিপল জেগে গেলে তখন আমরা আবার কলেজে গিয়ে লেখা-পড়ায় মন দেবো। যতই লেখাপড়া করি, এই সোশ্যাল অর্ডারে কেউ কিছু করতে পারবো না—পিপলের হাতে ক্ষমতা না এলে, সবাই পড়ে মার খাবো।"

কিন্তু কোনো কাজ হয় না। লোকটা অবজ্ঞাভরে এগিয়ে গেল। অনিলা সামনে দাঁড়িয়েছিল। বললাম, "ধরো তো।"

অনিলা গিয়ে ঝনাৎ করে বাক্সটা সামনে ধরলে। "আমাদের পার্টিকে কিছু দিন।"

"ওই পার্টিতে কিসসু হবে না," লোকটার দাঁত বেরিয়ে পড়লো।

অনিলাও তেমনি মেয়ে। কাঁচুমাচু করে মুখের দিকে তাকিয়ে আবদারে গলে পড়ে বললে, "দিন না কিছু!"

অব্যর্থ পেনিসিলিন পড়েছে। লোকটা এবার একটা আধুলি বাক্সে ফেলতে গেল। অনিলা বললে, "উঁহু, একটা টাকা দিতে হবে।" দাঁত বার করে হেসে লোকটা এক টাকা বাক্সে ফেললে। আমি তাজ্জব।

অনিলা বললে, "কখন ফিরবেন? আমার তো বাক্স বোঝাই। আপনার?"

"আমার কিছুই হচ্ছে না।"

অনিলা নিজের ক্ষমতা জানে। বললে, "সুবিনয়দার হুকুম, বাক্স বোঝাই না করে ফেরা চলবে না।"

শেষে অনিলা বাক্স পাল্টাপাল্টি করলে।

আমি হাঁদাগঙ্গারামের মতো এতক্ষণ ঝনাৎ ঝনাৎ করে মলাম, আর এখন কেমন অনিলা বসুর হাতে সেই বাক্সেই হুড়মুড় করে পয়সা পড়ছে। সাধে কি আর স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, নারী জাতির সাহায্য ছাড়া ভারতের মুক্তি হবে না।

আমার ইণ্ডিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান সেদিন পুরোপুরি হয়েছিল। পাবলিক বলো, পিপল বলো, জনতা বলো, জাতি বলো, সব ব্যাটাচ্ছেলের মনেই পাপ রয়েছে, শুধু দোষ হয় অনির্বাণ চাটুজ্যের।

মেজাজ সেদিন এতো বিগড়ে গিয়েছিল যে, সব প্রোগ্রাম বানচাল হয়ে গেল। ভেবেছিলুম চাঁদা আদায় শেষ করে অনিলাকে নিয়ে আলিপুর চিড়িয়াখানায় যাবো, দুপুর বেলায় জায়গাটা বেশ নির্জন থাকে। তা মাইরি হলো না। আমার বাক্সটা প্রায় বোঝাই করে অনিলা আমার হাতে ওটা ফিরিয়ে দিল। আমার কিরকম গা রি-রি করছিল। শুধু মনে হচ্ছিল, আমি মেয়েমানুষের অসৎ রোজগারে ভাগ বসিয়ে বেঁচে আছি।

এরপর ক্রমশঃ আমার অভিজ্ঞতা বেড়েছে। লেখাপড়ায় মন তেমন না বসলেও ডিগ্রী পরীক্ষায় এক চান্সে বেরিয়ে এসেছি।

এম-এ ক্লাশেও ভরতি হয়েছি। আর সেই সময় পিতৃদেব মাকে শোকসাগরে নিমগ্ন রেখে ওপারে পাড়ি দিয়েছেন।

বাবার অবর্তমানে সত্যি কথা বলতে একটু স্বাধীনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্ততঃ প্রতিদিনের চক্ষুলজ্জার হাত থেকে বেঁচেছি। তাছাড়া মায়েরও সংসারে তেমন মন না থাকায়, কাঁচা পয়সাটাও হাতে একটু বেশী

পরিমাণে এসেছে। নামকা-ওয়াস্তে একটা প্রাইভেট ট্যুশানিও ছিল। কুড়িয়ে বাড়িয়ে যা আসতো তাতে বালিকা-বন্ধুদের মনোরঞ্জন করেও মাঝে মাঝে দু'একটা পুরুষালী অ্যাডভেঞ্চারের খরচ থেকে যেতো।

মা জিজ্ঞেস করতেন, "ঠিকমতো পড়াশোনা করছিস তো?"

"পড়াশোনার ভোল এখন পাল্টে গিয়েছে মা। এখন আর বসে বসে বই মুখস্থ না—এখন আমাদের স্বাধীন চিন্তা করতে হয়।"

মা বিশ্বাস করে নিয়েছেন।

নানা সুখে অভ্যস্ত হয়ে এদেশ সম্পর্কে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমি ঠিক করে ফেলেছি এই পোড়া দেশ ছাড়বোই।

ইণ্ডিয়াতে জন্মেছি আমি, এই পর্যন্ত। আর কোনো সম্পর্ক নেই আমার ইণ্ডিয়ার সঙ্গে। আমি মাত্র একটা জীবন পেয়েছি, ভোগদখল করে যতটা পারি মজা লুটে যাই। যদি আমি একটু আনন্দেই না থাকলাম, তাহলে মা অত কষ্টে নিজের জীবন বিপন্ন করে আমাকে পৃথিবীতে নিয়ে এলেন কেন? ভগবানও আমাকে একখানা নয়, পাঁচ পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিলেন কেন? ভদ্রলোক যে বেহিসেবী এই বদনাম কেউ দেবেন না। খানিকটা মজা উসুল করতে না পারলে পড়তায় পোষাবে কেন?

আমি বহুদিন ধরে ইণ্ডিয়া থেকে কেটে পড়ার কথা ভাবছি। তবে আমাদের ভাবা তো। ভাবতে ভাবতেই বছর গড়িয়ে যায়। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাট চুকিয়ে একটা মাসিক কাগজে রিপোর্টারি করেছি। আর নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে বেচারা ইন্দ্রিয়গুলোকে একটু সুখ দেবার চেষ্টা করেছি।

যা বলছিলাম, এই ইণ্ডিয়া ছেড়ে দেবার চেষ্টায় আমি হন্যে হয়ে উঠেছিলাম। আমার মন কিছু চেয়ে বসলে তার আর ধৈর্য থাকে না। আমি একটু গোঁয়ার। তা দেখুন, যা বলেছি তাই করেছি তো। নিশ্চয় আমেরিকায় এসেছিলাম আমি, না হলে এই বোয়িং ৭০৭-এ চড়ে

আমেরিকা থেকে ফিরে যাচ্ছি কেমন করে ?

"প্লিইজ মি," বিমানবালিকা আমাকে ডাকছে। ভদ্রে, ওইভাবে বললে, মানে হয় আমাকে নিষ্পেষিত করো। একটু ভালভাবে উচ্চারণ করে এক্সকিউজ মি বলো, সুন্দরী। খেয়াল থাকে যেন অনির্বাণ চাটুজ্যের সঙ্গে কথা বলছো, মেয়েরা কোনো অনুরোধ করলে মহাভারতের দেবতাদের মতো আমি তা না রেখে পারি না!

কী বললে ? শ্যাম্পেন! ইকনমি ক্লাসে আজ শ্যাম্পেন দেওয়া হবে বিনা মূল্যে, তোমাদের এয়ারলাইনস-এর জন্মদিন। বেঁচে থাকো, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। ও হরি, ওসব নিয়ে কী করবে—তার বদলে তোমার ফিঁয়াসের চুমু পড়ুক। তা বাপু, এতে জিজ্ঞেস করবার কী আছে ? বিনামূল্যে যখন মদিরা পরিবেশন করবেই, তখন শ্যাম্পেন নিয়ে এসো।

বাইরে তাকিয়ে আছি আমি। নিচে, বহু নিচে প্রশান্ত মহাসাগর। বোয়িং কোম্পানি প্রশান্ত মহাসাগরের তর্জন-গর্জন ভেঙে দিয়েছে। তাদের তৈরি ৭০৭ বিমান কোনো পাত্তাই দেয় না মহাসাগরকে! নিজের খুশী মতো বহু ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। অবস্থা বুঝে প্রশান্ত মহাসাগর কেমন বিনয়াবনত হয়ে পড়েছে দেখুন—কে বলবে মহাসমুদ্র। ঠিক যেন গড়ের মাঠ পড়ে রয়েছে তলায়। তাও মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে না। মহাসাগর, মেঘ, ঝড় সবাইকে জব্দ করেছে বোয়িং ৭০৭। বেশী দেমাক দেখালেই ক্যাপ্টেন ওঁর ককপিটের কয়েকটা বোতাম টিপে দেবেন—বোর্ডে দু'একটা ছোট ছোট লাল আলো জ্বলে উঠবে, দু'একটা মিটারের কাঁটা ঘন ঘন কাঁপতে থাকবে, তারপর নাকটা উঁচু করে ওপরের দিকে উঠতে আরম্ভ করবে বোয়িং ৭০৭। মেঘের কারসাজি বেরিয়ে যাবে।

কোমরের নিরাপত্তা বন্ধনী আলগা করে আমি এবার একটু চরে আসি। পিছনের বাথরুম খালিই রয়েছে। চোখের সামনে আলোর

সিগন্যাল থাকায় বড় সুবিধে হয়। অতদূর গিয়ে দেখলেন বাথরুম 'বাগ্‌দেত্তা' (মানে এনগেজড্), তখন মেজাজ ঠিক থাকে না।

করিডর ধরে আমি আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করলাম।

ওই তো নিমাই মুখুজ্যে রয়েছেন। যা ভেবেছি তাই, ঠিক টুলটুলের পাশের সীটটা জোগাড় করেছেন সোনার চাঁদ! আমি গম্ভীর হয়ে রয়েছি—যেন এসব নজরে পড়েনি! আমি এগিয়ে যাচ্ছি। মিসেস ইন্দ্রাণী সেনও বেশ আরামে বসে রয়েছেন। স্যরি, ডক্টর মিসেস ইন্দ্রাণী সেন বলা উচিত ছিল। এবার ডক্টরেটটা বাগিয়েছে। ইন্দ্রাণী সেনের সমস্ত ব্যাপারটাই আমার জানা আছে। বড্ড হিসেবে গোলমাল করে ফেলেছে বেচারা—আরও কিছুদিন থাকা হলো না! মাইরি, তুমি ইজিলি থাকতে পারতে যদি না তোমার লেকচারে, তোমার সতীপনায়, অনির্বাণ চাটুজ্যেকে না চটাতে।

ইন্দ্রাণী সেন আমার দিকে হাত নাড়লেন। "অনির্বাণবাবু, আপনাকে দেখতে না পেয়ে ভাবছিলাম।"

"দেখবেন কী করে ? এ তো আর প্লেন না, একখানা সিনেমা হল !"

"আমি লাস্ট মোমেণ্টে এয়ারপোর্টে এসেছি। জিয়ার গাড়ি মাঝ-পথে খারাপ হয়ে গিয়েছিল !"

"জিয়া ছেলেটিকে আমার খুব ভাল লাগে," আমি মজা করবার জন্যেই বললাম।

ইন্দ্রাণী সেন এমন মুখের ভাব করছে যেন আর পাঁচটা লোকের মতই আর একটি লোক জিয়ায়ুর রহমন। আমি এখনই হাটে হাঁড়ি ভাঙতে পারি। কিন্তু এখন কথা বাড়াবো না, টেবিলে শ্যাম্পেন রয়েছে। ইন্দ্রাণীর সঙ্গে পরে কথা বলা যাবে। সামনে অনেক পথ পড়ে রয়েছে —টোকিও, হংকং, ব্যাংকক, তারপর কলকাতা।

আরে বাবা, গোটা প্লেনটাই দেখছি চেনা লোকে ভর্তি। লিণ্ডা রয়েছে। লিণ্ডা আবার ফ্রক ছেড়ে শালোয়ার কামিজ ধরেছে। মাথায়

একটু ছিট রয়েছে—না হলে নিজেকে মিস্ কাপুর বলে চালায় !

আর রয়েছে সুবিমল সেন। সুবিমল বেবি ন্যাপকিনে বেবিটা জড়িয়ে কোলে নিয়েছে। ওর বৌ সানড্রা সিগারেট টানছে।

তা বাপু মেমসায়েব বে-থা করেছো—বেবি হয়েছে, এখন একটু সামলাও ! আমার দিকে অমন করুণভাবে তাকালে কী হবে ? আমি কী করবো ? রাত্রিবেলায় সানড্রার অ্যাপার্টমেণ্টে ঘন ঘন বেড়াতে যাবার সময় খেয়াল ছিল না ? নিজে তো এতো স্ট্যাটিস্টিকসের খবর রাখো, জানো না সব রকম নিরোধ ব্যবস্থা সত্ত্বেও স্রেফ অ্যাক্সিডেণ্টের ফলে কত বেবি হচ্ছে আমেরিকায় ! তবে তোমাকে মানাচ্ছে না এই ফাদারের ভূমিকায়। একটা গোঁফটোপ কিছু পরে নাও, মিঃ সুবিমল সেন। সানড্রার গুগলি বোলিং-এর বিরুদ্ধে একটু সাবধানে ব্যাটিং করলে তুমিও এতদিনে নামের পাশে ডক্টর কথাটা লিখতে পারতে।

ও-বাবা, সুমিত্রও বসে রয়েছে শ্যাম্পেনের গেলাশ হাতে করে ! বড় একলা-একলা মনে হচ্ছে তোমাকে ? যে-খপ্পরে পড়েছিলে তুমি ! তোমার বাবা এত কষ্টে জাহাজ কোম্পানিতে কেরানিগিরি করে তোমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছিল, আর তুমি লটকে যাচ্ছিলে। আমি না থাকলে কী যে হতো তোমার। এর জন্যে তোমার বাবার উচিত টুলটুল এবং আমাকে খাইয়ে দেওয়া :

আমি এবার টয়লেটের কাছে এসে গিয়েছি। হোস্টেস দুটো ট্রলিতে ড্রিংকস্ সাজাচ্ছে।

ওদের মধ্যে যেটা একটু সুন্দরী সেটা গেল কোথায় ? তাকে নিশ্চয় ফার্স্টক্লাশে পাঠিয়েছে। ফার্স্টক্লাশের লোকরাই তো ফার্স্টক্লাশ জিনিস উপভোগ করবে ! তারপর যদি কিছু পড়ে থাকে তবে আমরা প্রসাদ পাব। দেখুন, মহাশূন্যেও কেমন শ্রেণীবৈষম্য রয়েছে। ভগবানের কাছে বিচারের জন্যে যাবেন যখন, তখনও ভগবান ফার্স্টক্লাশের লোকদের ফাইল আগে নিষ্পত্তি করবেন।

অথচ আমাদের হ্যাপলাদা কথাটা বুঝলে না। শ্রেণীহীন সমাজ তৈরী করবার লোভে সব খোয়ালে। কোথায় ভাল জামা কাপড় পরে, ভাল চাকরি করে, ভাল একটা মেয়েমানুষকে বে-থা করে দেশের সমস্যাগুলোকে ভাবীকালের হাতে তুলে দিয়ে, একটু সুখভোগ করবি, তা নয় ছেঁড়া জামা পরে, চায়ের দোকানে ভাঁড়ের চা খেয়ে, জলে পচে পচে মরলি। দুনিয়াতে কত রকমের ছেলেধরা ঘুরছে। কেউ ধরে নিয়ে গিয়ে তোমাকে বিকলাঙ্গ করে ভিক্ষে করাবে ; কেউ রূপ দেখিয়ে, চোখ ঘুরিয়ে, বিয়ের মন্তর পড়িয়ে তোমাকে ভেড়া বানিয়ে রাখবে ; আর কেউ আদর্শের কথা তুলে মতলব দেবে দেশের সেবায় নেবে পড়। সবাই ছেলেধরা—মন ভুলিয়ে তোমাকে চুরি করার তালে আছে। বোকামি করে যদি ফাঁদে পা দাও, তুমিই মরবে ! কই, কোনো শর্মা তো পারলে না অনির্বাণ চাটুজ্যেকে কব্জা করতে !

টয়লেটের মধ্যে ঢুকে, ভিতর থেকে লক করে দিলাম। প্লেনের এই একটা মাত্র জায়গায় একটু প্রাইভেসী পাওয়া যায়। এখানে আপনি নিজের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারেন।

গলার টাইটা একটু আলগা করে দিয়ে টিস্যু পেপারে মুখ মুছলাম। অমন ধবধবে কাগজটা আমার সঙ্গদোষে কালো চিট হয়ে গেল। মুখে একটু লোশন লাগালাম। এবার আয়নার দিকে তাকালাম। আহা কেমন সোনার চাঁদ মুখ ! কে বলবে এই মুখের মালিক অনেক পাপ করেছে। আসলে পাপকে পাপ ভাবলেই মুশকিল। না হলে, যা প্রাণ চায় তাই করো।

এই প্রাণ চাইলে করতে পারার পরিবেশের নামই তো স্বাধীনতা। আমাকে ফাঁদে ফেলে বাঁধবার চেষ্টা তো কম মেয়ে করলে না। ঐ যে লিণ্ডা কাপুর। ওর সম্বন্ধে আমি কি জানি না বলুন। ওর পেটে অ্যাপিনডিসাইটিশ অপারেশনের যে দাগ আছে তার বর্ণনা দিতে পারি আমি।

'লাভ ট্র্যাপ' কথাটা শুনেছেন? কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আপনি প্রেমের ফাঁদ পাতা আছে ভুবনে ভুবনে বলে কি মানে করেছিলেন, আর এখন তার কী অর্থ! এখনকার অর্থ শুনবেন?

লিণ্ডা স্টুয়ার্ট তো আমাদেরই ক্যামপাসের মেয়ে। দেখতে একসময় মন্দ ছিল না, বুঝতেই পারছেন। ওর চুলগুলো কেমন রূপোলী। আর চোখ দুটো শিকারী বেড়ালের মতো। দু'তিনটে ঘাটে ধাক্কা খেয়েছে লিণ্ডা—এই ছেলেধরার ব্যাপারে আর কী। ভেবেছিলুম আমাদের দেশেই বিয়ের বাজারে মেয়েরা পুরো সম্মান পায় না। দেখলাম, আমেরিকাতেও মেয়েদের অবস্থা তেমন কিছু সুবিধের নয়। প্রেমপর্বে ছেলেরা খেলাতে চায়, খেলতে চায়, কিন্তু ধরা দিতে চায় না। এসো, মাঝে মাঝে ডেট করি, চলো একটু চরে বেড়াই, একটু-আধটু চুমুটুমু খাওয়া যাক, মায় আমার বুকে আছড়ে পড়ো, গাছের ছায়ায় একটু পেটিং করি! কিন্তু তাই বলে আগুন জ্বালাতে রাজী নই। জোড়ে চার্চে যাবার প্রস্তাব কোরো না। প্রেম করা আর বিয়ে করা কি এক জিনিস? বিয়ের অনেক হাঙ্গামা। সামনে পরীক্ষা, তার চিন্তায় পাগল হচ্ছি।

আর মেয়েরা প্রেম করছে এই জন্যে যে, প্রেম না করলে বিয়ে হবে না। যেমন কোনো বেটাছেলেই ইণ্টারভিউ দিতে ভালবাসে না, তবু দিতে হয় এই জন্যে যে ইণ্টারভিউ না দিলে চাকরি হয় না। মেয়েরা প্রেমের হাটে যায় বর পাকড়াবার জন্যে। অদ্ভুত দেশ—মেয়ের বিয়ের জন্যে মেয়ের বাবা-মা গতর নাড়াবেন না। একি ইণ্ডিয়া পেয়েছ যে পাত্রের সন্ধানে মেয়ের বাবা, জ্যেঠা, খুড়ো, মামা ভূ-ভারত চষে বেড়াবেন, মেয়ের মা হাসিমুখে নিজের সব গয়না খুলে দেবেন, মেয়ের বাবা প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের শেষ নয়াপয়সাটি পর্যন্ত তুলে নেবেন, মেয়ের ভাই কোঅপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির সেক্রেটারির হাতে পায়ে ধরবেন। এদেশে বিয়েটা তোমার নিজের অ্যাফেয়ার—সুতরাং বর পাকড়াবার

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা মেয়েকেই করতে হবে। একেবারে কিং কিং খেলা। তোমার কোর্টে এসে ছোকরা কিং কিং করছে, যদি পাকড়াও করতে পারো তোমার। না পারলে তোমার হাতে খেয়ে পালাল পাখী!

লিণ্ডা কয়েকবার ঠকে একেবারে বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। শেষে বুঝলো, এইভাবে চলবে না। এতোলোক থাকতে আমাকেই কিনা প্রেমের ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করলে। মানে আমার সঙ্গে বিছানায় শুয়ে আমাকে বিয়ে করতে বাধ্য করা, যাতে অনাগত সন্তানের মুখ রক্ষে হয়। কিন্তু আমি অত বোকা নই। সময়মতো ছটকে বেরিয়ে এসেছিলাম। বুদ্ধির খেলায় হেরে গিয়েছিল লিণ্ডা। সেই থেকেই বাঙালীদের ওপর রেগে গেল লিণ্ডা। শ্রীমতী এখন এক পাঞ্জাবীর প্রেমে পড়েছে। সে ছোকরাও সটকেছে—কিন্তু লিণ্ডাকে একেবারে পাগলী করে দিয়েছে।

এরোপ্লেনটা আবার দুলতে আরম্ভ করেছে। ভেবেছিলুম কমোডের ওপর জেঁকে বসে একটু একাকীত্ব উপভোগ করবো। কিন্তু উপায় নেই। ওই দেখুন না, ক্যাপ্টেনের নির্দেশ লাল অক্ষরে জ্বলে উঠেছে—রিটার্ণ টু সীট। নিজের সীটে ফিরে গিয়ে আবার কোমরে দড়ি বেঁধে জেলের কয়েদীর মতো বসে থাকো।

জাপানী স্টুয়ার্ডেস বোধ হয় নতুন। একটু সামলে নিতে কষ্ট পাচ্ছে। আমার ওপরেই করিডরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আমি যতটা জোরে ধরা উচিত ছিল তার থেকেও জোরে ধরে রইলাম ওকে। তারপর আমার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে বললে, "স্যরি।"

স্যরি কেন বাপু? যতবার খুশী তোমরা এইরকম হুমড়ি খেয়ে পড়ো, আমি টেনে তুলে দিচ্ছি।

কোমরে দড়ি বেঁধে শ্যাম্পেনের গেলাশ নিয়ে বসেছি। শ্যাম্পেন

নিয়ে তুনিয়ার লোকেরা এতো মাতামাতি করে কেন বুঝি না। পৃথিবীতে পুরুষমানুষের জন্যে একটাই পানীয় তৈরী হয়। তার নাম হুইস্কি। হুইস্কি আমাকে বোঝে, আমি বুঝি হুইস্কিকে।

একটা গেলাশ শ্যাম্পেন শেষ করে দিয়েছি। হাজার হোক বিনা পয়সার মাল। মেয়েটা হাসিমুখে আবার এসে দাঁড়াল। আমি ওর দিকে এমন করুণভাবে তাকালাম যে, গেলাশটা আবার বোঝাই করে দিল।

শ্যাম্পেন দিয়ে বিমান কোম্পানি জন্মদিন উদ্‌যাপন করছে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এর মধ্যে চাপা রসিকতা আছে। অনির্বাণ চ্যাটার্জির হাত থেকে মুক্তি পেয়ে আমেরিকা শ্যাম্পেনের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। আপনার বউ ডাইভোর্স স্যুট জিতে যে পার্টি দিচ্ছে, আপনিও তালে-গোলে সেখানে হাজির হয়েছেন।

এই যে আমি মার্কিন মুলুকে এলাম, এটাই তো আশ্চর্য ঘটনা। ইণ্ডিয়াতে কত ভাল ভাল ছেলে একবার বিদেশে আসবার জন্যে হা-পিত্তেশ করছে। যারা অবস্থাপন্ন তারা নিজের খরচেও আসতে রাজী। কিন্তু এল কে? অনির্বাণ চাটুজ্যে। তাও ছাত্র হিসাবে নয়।

যা বোকা ছিলাম আমি, হয়তো ছাত্র হয়েই চলে আসতাম এদেশে, যদি না সেবার শিপ্রার স্বামীর সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। কলম্বাস থেকে ডক্টরেট হয়েছে শিপ্রার স্বামী পার্থ চৌধুরী। আমাকে চা খেতে ডেকেছিল মণ্টা। নতুন জামাই-এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে। সবে তু' সপ্তাহ হয়েছে বিয়ের পর। তখনও সিঁথির সিঁতুরটা ঠিক মত লাগাতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি শিপ্রা—সমস্ত কপালে একটা লালচে আভা থেকে যাচ্ছে।

শিপ্রা নিজেই আলাপ করিয়ে দিল—"দাদার বিশেষ বন্ধু অনির্বাণ চ্যাটার্জি।" পাকা গৃহিণীর মতো শিপ্রা আমাকে জিজ্ঞেস করলে, "চা খাবেন তো?"

গুরুজনী ফলিয়ে বললাম, "আমরা তো ঘরের লোক। নতুন জামাইকে আগে দেখাশোনা করো।"

শিপ্রা নিজের সম্পত্তিটার হাড়হদ্দ এই ক'দিনই জেনে নিয়েছে। কেমন বললে, "ও চা খায় না। কফি খায়, তাতেও আবার চিনি-দুধ থাকে না।"

পার্থকে বললাম, "কতদিন ছিলেন স্টেটসে ?"

"পাকা চার বছর। যা ভুলই করেছিলাম ছাত্র হয়ে গিয়ে। আমাদের যা কোয়ালিফিকেশন ছিল তাতে একেবারে রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে যাওয়া যেত। ওখানে গিয়ে ব্যাপারটা বুঝলাম। কিন্তু তখন কোনো উপায় নেই।"

পার্থই আমার চোখ খুলে দিল। বললে, "তা হলে কিছু টাকাও পাওয়া যায়, আর টুক করে থিসিসটা করেই ফিরে আসা যায়।"

তা হলেও তো বই ঘাঁটতে হবে। এই ঘাঁটাঘাঁটি জিনিসটাই আমার ভাল লাগে না।

কিছুদিন ঘোরাঘুরি ধরাধরির পর আমার মাথায় আরও বুদ্ধি এল। সেই বুদ্ধির জোরেই চিঠি লিখেছিলাম বেণীমাধব রায়কে। সত্যি বলছি, কিছুই আশা করিনি। কিন্তু বহুদিন বিদেশে থেকে বেণীমাধব যে চিঠির উত্তরের ব্যাপারে সায়েবদের বদ দোষ পেয়ে গিয়েছেন তা বুঝবো কী করে ? আমি তো নেহাত নিজের দরকার না হলে কাউকে চিঠি লিখি না। কত লোক তো আমাকে চিঠি লিখে যাচ্ছে, আমি অত বোকা নই যে উত্তর দিয়ে দেব। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে যা চিঠি লিখে থাকি সে কেবল সুন্দরী মেয়েদের। হয়তো কোথাও খোঁজ পেয়ে গেলাম, মনটা আর একবার দেখবার জন্যে ছটফট করছে। তাও যদি ফোন থাকে চিঠি লিখি না। কিন্তু এমন কপাল, যে-মেয়েদের চোখে ধরে তাদের ফোন থাকে না, আর ফোনওয়ালা যেসব মেয়ের খবর পাই তাঁরা এক একটি চরিত্রসংশোধনী সালসা !

বেণীমাধব যে রাজবল্লভ সাহা সেকেণ্ড বাই লেনকে মোটেই ভোলেননি তা চিঠি থেকে বুঝলাম। নিজের হাতে মস্তবড় চিঠি লিখেছেন। আমিও উত্তর দিলাম। তারপর এই চিঠি চালাচালির পরিণাম হিসেবে আমাকে আমেরিকায় হাজির হতে হলো।

ইণ্ডিয়ান শহরের পচা গলি, খাটা পায়খানা, খোলা নর্দমা, সব ভুলে গিয়ে এখন আমি মিঃ এ চ্যাটার্জি! নিউটন ইউনিভার্সিটির স্কুল অফ এশিয়ান স্টাডিজ-এ গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় লিপ্ত আছি। বৃত্তি হিসেবে যে ক'টা ডলার পাচ্ছি তাকে সাড়ে সাত দিয়ে গুণ করে বললে পরশ্রী-কাতর বাঙালীর পিলে চমকে যাবে।

আমার ভোল পালটাতে শুরু করেছে। স্বদেশে দিবানিদ্রা ও অত্যধিক কার্বোহাইড্রেট পেটে পুরে কোমরের যে বাড়তি মাপ আমার দুশ্চিন্তার কারণ হতে শুরু করেছিল বিদেশে তা আয়ত্তের মধ্যে এসেছে। কোন এক সমব্যথী রসিক ভদ্রলোক অনেক দুঃখে লিখেছিলেন, মধ্যবয়সে বয়স নয়, শরীরের এই মধ্যদেশটাই মত দুশ্চিন্তার কারণ! সুন্দরী তরুণীদের এই ভুঁড়ির ওপর যে এত বিরক্তি কেন সে নিয়ে গবেষণা করলে হয়তো কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে। এই ভুঁড়ির প্রতি সর্বদেশ, সর্বধর্ম ও সর্বশ্রেণীর রমণীরা সমানভাবে বিরক্ত। অতএব কোমর সম্বন্ধে আমি খুবই সচেতন। প্রোটিন এবং ভিটামিন যুক্ত লো-ক্যালরি খাবারে আমার অ্যাপার্টমেন্টের ফ্রিজ বোঝাই করে রেখেছি।

আমার অফিস ঘরের নম্বর ৯০৮। অর্থাৎ ৯ তলার আট নম্বর ঘর। এই ঘরে আমি একলা বসি। আমার চুল ইতিমধ্যেই তেলবিহীন হয়ে বিলেতফেরতদের মত হয়েছে। আমার একটা বিরাট এটাচি কেস জুটেছে, যেটা সব সময় বোঝাই, ঠিক যেন ন' মাস! আমার একটা ছোট্ট পোর্টেবল টাইপরাইটার আছে। এ-ছাড়াও আমার বগলে বই থাকে। আসলে আমি যে খুবই ব্যস্ত তা দুনিয়ার লোকদের সর্বদা বুঝিয়ে যেতে হবে।

প্রথম ছ' মাস এখানে আমার খুব অসুবিধা হয়েছিল। গাড়ির অভাবে বাইরে কোথাও যাওয়া হতো না। ক্যামপাসের মধ্যেই পদযুগল ভরসা করে চলে বেড়াতে হতো। তারপর আমি ম্যানেজ করেছি। একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড ফোকসওয়াগেনের মালিক হয়েছি। ফোকসওয়াগেন ছোট্ট গাড়ি, কিন্তু জার্মান জান! বুকে হাঁটু দিয়ে চালাও, কোনো অভিযোগ নেই। আর খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে একেবারে বাউনের ঘরের বিধবা—শুধু খেটে মরছে, তেল খরচ নেই বললেই চলে।

দু-একজন ইণ্ডিয়ান ছোকরা আমাকে জিজ্ঞেস করেছে, "আপনার কোন্ ইউনিভার্সিটি?"

"ক্যালকাটা। জানেন তো মরা-হাতি লাখ টাকা।"

ছোঁড়াগুলোর হিংসেয় বুক জ্বলছে। তারা সব ছাত্র হয়ে এসেছে, সপ্তাহে সপ্তাহে পরীক্ষা দিতে দিতে পশ্চাতের বাঁধন ছিঁড়ে যাচ্ছে। আর আমি ফেলোশিপ নিয়ে এসেছি। এই ফেলোশিপ কী জিনিস আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না। ওদের মুখ দেখে বুঝতে পারি, ওদের জানবার ইচ্ছে আমি কেমন করে এমন সম্মান ও সুখের কাজ জোগাড় করলাম। বাবা-খুড়ো কার জোরে নিউটন ইউনিভার্সিটিতেও আমি মজা লুটছি।

তোরা খুঁজে মর, তোদের বুক জ্বলুক, আমি কেন তোদের বেণীমাধব রায়ের কথা বলতে যাব! মগজে ঘিলু থাকলে তোরাও তো বেণীমাধবকে লিখতে পারতিস, তিনি কিছু আমার পার্সোনাল প্রপার্টি নন।

এখানে এসেই, মালপত্তরের একটা গতি করে বেণীমাধবের খোঁজ করেছিলাম। সত্যি বলতে কি, মনের মধ্যে একটু চাপা অভিমানও হয়েছিল। আশা করেছিলাম, বেণীমাধব কাউকে হয়তো এয়ারপোর্টে পাঠাবেন আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে। গাঁয়ের লোক যে মিষ্টি তা

গাঁয়ের বাইরে না বেরুলে খেয়াল থাকে না। (তার মানে এই নয়, আমিও গাঁয়ের লোকদের জন্যে কিছু করব। এই তো তিনটে ছোঁড়া, আমাদের ইস্কুলের প্রাক্তন ছাত্র, আমাকে চিঠি দিয়ে দিয়ে এলে গেল। আমি প্রত্যেকটা চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি, অবশ্য খাম থেকে টিকিট খুলে নেবার পর। আমার এক গার্ল ফ্রেণ্ড তার জারজ ছেলেটার জন্যে স্ট্যাম্প সংগ্রহ করে। মেয়েটা আমাদের অ্যাপার্টমেণ্ট বাড়িতেই ছ' তলায় থাকে। আমি চিঠিগুলো ছিঁড়ে ফেলি, আর বিড় বিড় করি··· এক ইস্কুলে পড়েছ বলে মাথা কিনে নিয়েছ!)

খবর নিয়ে জানলাম, বেণীমাধব এখন নিউটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে। কয়েক সপ্তাহের জন্যে কানাডার টরণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক পড়েছে। সপরিবারে সেখানেই গিয়েছেন।

আমি অবাক হয়ে ভাবতাম, দেখ মজা। কোথায় রাজবল্লভ সাহা সেকেণ্ড বাই লেন, কোথায় নিউটন। আবার তাতেও পোষাচ্ছে না —এবার টরণ্টো। কোষ্ঠীর জোর মাইরি, শুধু খেটেখুটে এসব হয় না।

আমি দেখছি, এখানে সবাই ব্যস্ত, না হয় ব্যস্ত থাকার অভিনয় করে। আমি ব্যস্ত হতে পারি না। অত ব্যস্ত হলে আমার শরীরের সব নাট-বল্টু খুলে যাবে। আমি এসেছি কাজ করতে নয়, নাম করতে। তাছাড়া ইণ্ডিয়া আমার ভাল লাগে না তাই চলে এসেছি। ইণ্ডিয়াতে যেভাবে হুইস্কির দাম বেড়ে যাচ্ছে, তাতে সুযোগ পেলে সমস্ত ভদ্রলোক সেখান থেকে চলে আসবে। হতভাগারা জাতীয় উন্নতির নাম করে নিজেদের ফষ্টিনষ্টির টাকা মদের ট্যাক্স থেকে তুলতে চাইছে।

প্রথম সপ্তাহে আমি একটু সাবধানে ছিলুম। একটু সামলে নিতে সময় লাগে, কোথায় পিছলে পড়ব কে জানে। আমাকে একটা ঘর দিয়েছে ওরা—নিজস্ব অফিস ঘর, বাইরে আমার নামও লেখা আছে। ঘরের ভিতর অনেক বই ও ম্যাগাজিন ঢুকিয়ে ফেলেছি। বই-ফই না থাকলে ঘরটা কেমন নেড়া-নেড়া দেখায়। ঘর থাকার সুবিধে—আমি

কী করছি কেউ দেখতে পায় না। আমি একটু স্বাধীনভাবে নিজের ব্যক্তিগত সমস্যাগুলো নিয়ে মাথা ঘামাতে পারি। নিতান্ত ব্যক্তিগত টেলিফোনালাপের জন্যে বেল সাহেবের আবিষ্কৃত যন্ত্রটি ব্যবহার করতে পারি।

অফিস থেকে বেরিয়ে সেদিন আমি আমার টাইপরাইটারটা নিয়ে রাস্তায় নামতে যাচ্ছি, এমন সময় ফ্রকের ভিড়ের মধ্যে শাড়ি দেখতে পেয়ে একটু চিত্তচাঞ্চল্য ঘটলো। আমার চশমার মধ্য দিয়ে ভদ্রমহিলার দিকে তাকালাম। অনেকটা বাংলা সিনেমার প্রথম দৃশ্যের মত। আমার ভূমিকায় যেন অভিনয় করছেন উত্তমকুমার। আমি একজন প্রথিতযশা ছাত্র, দেশের সব পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে বিদেশে এসেছি রিসার্চ করতে। আমার একটিমাত্র স্বপ্ন, নতুন কিছু আবিষ্কার করে মানব জাতির মঙ্গল করা এবং দেশ-জননীর মুখোজ্জ্বল করা। গর্ভধারিণী জননী ছাড়া আর কোনো রমণী সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। সুন্দরী সুন্দরী রমণী থেকে আমি শতহস্ত দূরে থাকি। আর ওদিকে যেন সুচিত্রা সেন। উনিও ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, উনিও বড় হতে চান এবং কোনো পুরুষ মানুষকে পাত্তা দেন না। কিন্তু আজ থেকে ওঁর বড় হওয়ার স্বপ্নে বালি পড়বে, উনি এখন থেকে শুধু উত্তমকুমারকেই চাইবেন। এই একটা চাহনিতে উত্তমকুমারকে অর্থাৎ এই মুহূর্তে আমাকে, এসটাবলিশ করতে হবে মেয়েছেলেতে আমার কোনো রুচি নেই, তুমি সুচিত্রা সেন বলে আমার মাথা কিনে নাওনি। আমি সেই-ভাবেই তাকালাম।

কিন্তু ভদ্রমহিলা ফিক করে হেসে ফেললেন, "আপনিই তো অনির্বাণবাবু। আমার নাম ইন্দ্রাণী সেন, মিসেস।"

আ মলো যা! মিসেস কথাটা অত ঢাক বাজিয়ে বলবার কী দরকার ছিল? তা হলে মিস্টার সেন নিশ্চয়ই কাছেপিঠে কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন, কিন্তু তাতে বাংলা সিনেমা দাঁড়ায় না; আর ওই দেড়মণি

নায়িকা নিয়ে ফরাসী ছবিও করা সম্ভব নয়।

ভদ্রমহিলা নিজেই কফিপানের আহ্বান জানালেন। ক্যানটিনে আমরা দুটো কফি নিয়ে বসলাম। আরও দুটো ছোঁড়া এসে বসল।

ইন্দ্রাণী বললেন, "ডেট আরম্ভ করেছেন?"

"আজ্ঞে", প্রশ্নের বাকি অংশটা চোখের ইঙ্গিতে সারলাম।

"উইক এণ্ডে গার্ল ফ্রেণ্ডদের সঙ্গে ফূর্তি করা, যা আমাদের দেশের ছেলেরা এখানে এসেই আরম্ভ করে। আমার তো লজ্জায় মাথা কাটা যায়।"

"এর মধ্যে কী দোষ দেখছেন, ইন্দ্রাণীদি?" বললে একটি ছেলে।

"দোষ না? ইণ্ডিয়ার ট্রাডিশন কী? ইণ্ডিয়া কি এদের মত একটা চরিত্রহীন বাউণ্ডুলে দেশ?" উত্তর দিলেন ইন্দ্রাণী।

ইন্দ্রাণীদেবী মনে হচ্ছে আমারও গার্জেন হতে চান। না বাপু, এই বিদেশে একটু ঝাড়া হাত-পা হতে এসেছি।

"আপনার তো সিনিয়র ফেলোশিপ?" জিজ্ঞেস করে একজন ছোঁড়া।

"আজ্ঞে হ্যাঁ," প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করি।

কিন্তু রয়টারের বিশেষ প্রতিনিধি ইন্দ্রাণী সেন বসে আছেন, তার উপায় নেই। বললেন, "উনি তোমাদের মত ডক্টরেটের রবারস্ট্যাম্প লাগাতে আসেননি। উনি যে কাজ করছেন, তাতে দেশের মানুষের মঙ্গল হবে। উনি এসেছেন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ওপর বিস্তারিত পড়াশোনা করে, এই সমস্যার ওপর নতুন আলোকপাত করতে।"

আমি তো অবাক! ইন্দ্রাণী সেন জানলেন কী করে? একজন ছোকরা বললে, "ইন্দ্রাণী সেনের কাছে কিছুই অবিদিত থাকে না। সব খবর এসে যায়। কোন্ ইণ্ডিয়ান ছেলে কোন্ মেয়ের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করছে, কোন্ ছোকরা গত পরীক্ষায় খুব খারাপ করেছে, কোন্ রিসার্চ অ্যাসিস্টেণ্ট বাবাকে টাকা পাঠানো বন্ধ করেছে, সব খবর এসে যায়

ওঁর কাছে।"

ছেলে ছুটো ঘড়ি দেখলে। "ওরে বাপরে, এখনই ল্যাবে যেতে হবে," বলে তারা ছুটলে। "ডঃ সোয়েটজার সেদিন লেট হবার জন্যে যা শুনিয়ে দিলেন। বললেন, ইয়ং এশিয়ান তোমাদের প্রাচীন সভ্যতা; হু'পাঁচ হাজার বছর নিয়ে তোমাদের কারবার। কিন্তু এই দেশ নতুন, ছু'-তিন শ' বছরে আমাদের সবকিছু গড়ে তুলতে হয়েছে; আমাদের কাছে প্রতি সেকেণ্ড মূল্যবান।"

ইন্দ্রাণীদেবী গর্জে উঠলেন, "লেট হয়েছে, লেট হয়েছে, তাই বলে জাত তুলে কথা বলবে! নিজে তো হিটলারের খেদানিতে ছত্রিশ সালে জার্মানি ছেড়ে এখানে এসেছে।"

"বলে কিছু লাভ নেই ইন্দ্রাণীদি, আমাদের সমস্ত রিপোর্টগুলো উনিই লিখবেন।"

ইন্দ্রাণী বললেন, "আমার স্বামী আসবার সময় বাব বার বলে দিয়েছেন, কখনও ইণ্ডিয়ার অপমান সহ্য করবে না, তাতে তোমার থীসিস হোক আর না হোক।"

ইন্দ্রাণীর সঙ্গে পরিচয়টা ক্রমশ জমে উঠেছে। ওঁর এই নেকু-নেকু ভাবটা আমার ভাল লাগে না। এটা তাহলে বোঝা গেল, দেবরাজ ইন্দ্র ইণ্ডিয়াতেই পড়ে রয়েছেন। "ওঁকে তিনদিন চিঠি লেখা হয়নি, কী বিশ্রী ব্যাপার বলুন তো," বিরহিনী ছুঃখ প্রকাশ করলেন।

সর্বনাশ। মহিলা কি স্বামীকে চিঠি লেখবার জন্যেই এদেশে এসেছেন।

উনি বললেন, "আমাদের চুক্তি ছিল সপ্তাহে ছু'জনেই তিনখানা করে চিঠি লিখবো। উনি লিখে যাচ্ছেন, কিন্তু আমাকে হুকুম দিয়েছেন থীসিস সাবমিট না হওয়া পর্যন্ত অত কষ্ট করতে হবে না। কিন্তু হিন্দু ঘরের বউ, মন কি মানে?"

"মোটেই নয়, মোটেই নয়", আমি সায় দিই।

"চলুন আমার ঘরে", আহ্বান জানালেন ইন্দ্রাণী সেন।

অ্যাপার্টমেন্টে এসে বললেন, "প্রথমে ডরমিটরিতে ছিলুম। সে যা কাণ্ড আপনাকে কী বলবো। আমার এক রুমমেট ছিল। তার ফিঁয়াসে তো দুপুরবেলায় ডরমে হাজির হতো। ওদের নির্জনতা দেবার জন্যে আমাকে কমনরুমে বসে থাকতে হতো।"

মনে মনে ভাবলাম, মন্দ কী? কিন্তু মুখে আশ্চর্য হবার অভিনয় করে বলতে হলো, "বলেন কী!"

"আমার তো খাটে শুতে গা ঘিন ঘিন করতো—বান্ধবীকে বলতেও পারি না, আমার খাটে বন্ধুকে বসিও না!"

আমি ওঁর ঘরে চেয়ারে বসে আছি, ভাগ্যে উনি আমার স্বরূপ জানেন না। ঘরে আবার কর্তার ছবির সামনে ধূপ জ্বেলে দিলেন।

যতক্ষণ ছিলুম ওঁর আপেল ধ্বংসালুম, আর শুনে গেলাম, "মার্কিন দেশটার কোনো চরিত্র নেই। এইটুকু-টুকু মেয়ের বুকের পাটা যদি দেখেন। আমাদের দেশে কুকুর বেড়ালের যেমন সেক্স, সেই রকম!"

আমি আবার বোকা সাজলুম, "বলেন কী?"

"মেয়েদের ডরমিটরিতে যে নরককাণ্ড হয়, সে আপনাকে কী বলবো। একই ছোকরাকে নিয়ে তিন-চারজন মেয়ে খেয়োখেয়ি করছে। আমি তো ভেবেছিলাম পালাবো। ওঁকে তো আর এসব কথা লিখতে পারি না। আমাদের শিক্ষাই যে অন্যরকম—স্ত্রীও স্বামীকে এইসব কথা লিখতে পারবে না। তা উনি আমাকে লিখেছেন, তুমি সুযোগ পেয়েছো, আমি পাইনি। তুমি ডক্টরেট না করে কিছুতেই ফিরবে না। দেখুন না, কত চেষ্টা করছি ওঁকে যে-কোনো একটা কাজ দিয়ে এখানে আনি। কিন্তু বাংলার এম-এ. কোনো ডিমাণ্ড নেই। তা আপনাকে যা বলছিলাম, ডরমিটরি ছেড়ে এই অ্যাপার্টমেণ্ট নিলুম। তবে একটু শান্তিতে আছি।"

আমি সুবোধ সুশীল বালকের মতো শুনে যাচ্ছি। আমি নতুন

এসেছি, এখনই গোলমালে নেমে লাভ কী?

ইন্দ্রাণী বললে, "আমার ইচ্ছে হয়, এখানকার সব ইণ্ডিয়ান ছেলের বাড়িতে বাবা-মাকে একখানা করে চিঠি লিখে দিই। সোনার চাঁদরা গলার দড়ি ছাড়া পেয়ে এখানে যে কী কাণ্ড করছে, বাবা মা জানুক।"

আমি মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। উনিই বললেন, "আপনাকে বলছি, এদেশের ছেলেমেয়েদের নৈতিক শিক্ষার জন্যে ইণ্ডিয়াতে পাঠানো উচিত। ইণ্ডিয়াতে আজকাল প্রেমটেম একটু-আধটু হচ্ছে না, এমন নয়। কিন্তু সে-প্রেম আর এই প্রেমে আকাশ-পাতাল পার্থক্য।"

একটু ঢোক গিলে মিসেস সেন বললেন, "সত্যি বলছি, আকাশ-পাতাল। এই তো কলকাতায় আমাদের বান্ধবী ছন্দা প্রেম করলে আমাদের কলেজের এক ছোকরা অধ্যাপকের সঙ্গে। কিন্তু সে-প্রেম মানে কী? দু'জনে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা, আর্ট, হিস্ট্রি, সাহিত্য, সিনেমা নিয়ে তর্ক করা, পাতার পর পাতা চিঠি লেখা, আর দু'একবার ব্যাণ্ডেলে গঙ্গার ধারে এক ফুট দূরত্ব রেখে চুপচাপ বসে থাকা। শুধু সুশোভন যেদিন ছন্দাকে প্রস্তাব করলে, সেদিনই এক সেকেণ্ডের জন্যে ওর হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল। কিন্তু তাও ছন্দা সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে নিয়েছিল।"

এরপর আমাকে সাক্ষী মানলেন ইন্দ্রাণী। "আপনি প্রেমটেম করেছেন কিনা জানি না। আপনার মুখ দেখলে তো মনে হয় ওসবের মধ্যে আপনি নেই। যদি আপনি কারুর সঙ্গে প্রেম করেও থাকেন, তাহলে আপনি মেয়েটাকে যে কিস করেননি এটা আমি লিখে দিতে পারি।"

এবার আমাকে দিয়ে নিজের কথার সায় দিয়ে নিতে চান ইন্দ্রাণী-দেবী। জিজ্ঞেস করলেন, "তাই না?"

কী ফ্যাসাদে পড়া গেল। মিথ্যে কথা বলতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এখনও নিষ্কাম মিথ্যাভাষণের স্তরে উঠিনি, শুধু মিথ্যে

বলার আনন্দে মিথ্যে বলতে ভাল লাগে না, একটু কিছু কয়দা আসা চাই। কিন্তু কী যে করি। ওকালতী প্যাঁচ মেরে বললাম, "তা তো বটেই, আমাদের সমাজকে তো মেয়েরাই চিনেছে।"

"ক'দিন এসেছেন এখানে?" জিজ্ঞেস করি।

"আপনার থেকে খুব সিনিয়র নই, এই কয়েকমাস হলো। এরই মধ্যে মনে হচ্ছে এক যুগ হয়ে গেল।" ভদ্রমহিলার দীর্ঘশ্বাসে বুকটা ওঠানামা করলো।

"বিরহে ওরকম হয়ে থাকে!" আপনাদের বৈষ্ণব শাস্ত্রটাস্ত্রগুলো একটু নেড়েচেড়ে দেখুন না!

বেরিয়ে আসবার সময়েও উপদেশ: "এখানকার এই ডেটিং জিনিসটা সম্বন্ধে সাবধানে থাকবেন।"



যদি-বা কিছুদিন চেপেচুপে থাকতাম, এবার ডেটিং-এর জন্যে মন নেচে উঠলো। নিজের অফিসে বসেও ডেটিং-এর কথা ভাবছি।

দু' একটা লোকের সঙ্গে আলাপ হতে আরম্ভ করেছে। আমাদের ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর ডঃ স্মিথকে দিয়ে কিছু হবে না। একেবারে বেরসিক।

প্রফেসর স্মিথ বই আর কাজের মধ্যেই ডুবে আছেন। ঘরসংসার আছে এই পর্যন্ত। এশিয়া সম্পর্কে পড়বার জন্যেই ভগবান যেন এঁকে পয়দা করেছিলেন। এঁর গল্প শুনলাম। পঁচিশ বছর বয়সে এক পরিকল্পনা নিয়েছিলেন—কয়েক খণ্ডে এশিয়ার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রামাণ্য বই লিখবেন। বিয়ে করেছিলেন নিজের ছাত্রীকে। বউকে

রাজী করিয়েছিলেন, একটু অপেক্ষা করতে হবে। বইটার কাজ সামান্য গুছিয়ে নিয়ে, বেরোবেন হনিমুনে। তা ইতিমধ্যে ওঁরা দু'জনেই ঘাটে পা দিলেন—এখনও প্রোজেক্ট শেষ হয়নি। হনিমুনটা আটকে আছে। আশা করছেন সামনের বছর শেষ খণ্ড প্রকাশিত হবে, তখন বিলম্বিত মধুযামিনীতে বেরোবেন স্মিথ-দম্পতি।

এইসব লোকের সঙ্গে বেশীক্ষণ কথা বলা যায় না। এরা সবাইকে নিজেদের গাড্ডায় ফেলতে চায়। আমি অত বোকা নই। যে ক'টা দিন বেঁচে আছি (একেই আমার কোষ্ঠীতে লেখা আছে, জাতক কোন এক গ্রহের ফেরে স্বল্পায়ু হতে পারে) আমি বাপু আমার মনের সাধ মিটিয়ে নিতে চাই। হাজার হোক দশটা নয়, পাঁচটা নয়, একমাত্র সন্তানের মতো একটা মন। ওকে একটু আদর করবো না, একটু প্রশ্রয় দেবো না ?

বুড়ো স্মিথ ইণ্ডিয়ার অনেক খবরাখবর রাখেন। সংস্কৃত চর্চা করেছেন। হঠাৎ এক কোটেশন ঝাড়লেন, আমাদের কয়েকটা স্তর—জড়, প্রাণ, বুদ্ধি, বোধ। প্রথমে জড়, তারপর প্রাণের উৎপত্তি, প্রাণীদের মধ্যে সামান্য কিছুর বুদ্ধি আছে। তারপর বুদ্ধিমান মানুষের চরম সাধনা বোধোদয়ের। বুদ্ধ, শঙ্কর, যীশু, মহম্মদ, রামানুজ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ সবাই নাকি এই বোধের তপস্যা করেছেন। আমাদের মনের মধ্যেও নাকি এই বোধ ঘুমিয়ে, কিংবা অর্ধজাগরিত হয়ে রয়েছে।

ওসব কথায় কান দিচ্ছি না বাবা। ওসব আমার বাপ পিতামহরা বহু বছর চটকেছেন, তোমরা নতুন এ-লাইনে আসছো, তোমাদের আঠা বেশী। আমি চাই, খুব নাম করতে, অনেক টাকা করতে। কিন্তু আমাকে যেন খাটতে না হয়। পরিশ্রম জিনিসটা আমার ভাল লাগে না। আর আমি চাই সুন্দরী সুরসিকাদের সুমধুর সান্নিধ্য। তারপর ইণ্ডিয়া গোল্লায় যাক, কাজকর্ম মাথায় উঠুক, যারা অর্ধভুক্ত পশুর মতো

জীবন যাপন করছে তাদের দুর্গতি আরও বৃদ্ধি পাক. আমার কোনো মাথাব্যথা নেই।

কয়েকদিন পরেই আমার অ্যাপার্টমেন্টের লিফটে উঠতে গিয়ে একটা মেয়ের সঙ্গে আলাপ হলো। আমাদেরই ডিপার্টমেণ্টে ডক্টরেট করছে। আমাকে উইশ করলে; বললে, "আমার ছেলে ডাকটিকিটের ভক্ত। টিকিটগুলো দিও তো যখন চিঠিপত্তর আসবে।"

এই ডাকটিকিট থেকেই আলাপ হয়ে গেল। ছেলেকে নিয়ে ওলগা এসেছে আমার ঘরে, কিন্তু ছেলের বাপের দর্শন নেই। গুজব থেকেই বুঝলাম, রেজিস্টার্ড কোনো বাবা নেই ছোকরার। কিন্তু সেসব নিয়ে কেউ এখানে তেমন মাথা ঘামায় না, এদেশে সময় অতো সস্তা নয়।

ওলগাই একদিন হেসে বললে, "ও মা, মুখ ঝুড়ি করে ছুটির দিনে বসে আছ কেন? কোনো ডেট নেই?"

"বিদেশে বিভুঁইয়ে কে আমার সঙ্গে ডেট করবে বল?" আমি করুণভাবে উত্তর দিই।

"কি যে বলো অনি! আমাকে বলনি কেন? গণ্ডায় গণ্ডায় বান্ধবী রয়েছে। দাঁড়াও। কালকে ব্লাইণ্ড ডেট করবে?"

সে বস্তুটি কী ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। ওলগাই বুঝিয়ে দিল। নিজেদের মধ্যে জানা-শোনা নেই, অথচ কোনো কমন বন্ধুর পরামর্শ অনুযায়ী ডেট করা। এই ব্লাইণ্ড ডেট থেকে অনেক বিয়ে হয়ে যায়।

ওলগা আমার টেলিফোন তুলে নিয়ে ডায়াল ঘোরাতে আরম্ভ করল। "প্রথমে ভিভিয়ানকে রিং করি, খুব চার্মিং মেয়ে, ফিগারও খুব ভাল।"

"ভিভি, আমি ওলগা বলছি। তোমার খবর কী? কারুর সঙ্গে স্টেডি হচ্ছিস নাকি?...হচ্ছিস না...ভেরি গুড। শোন্, এখানে একজন ইণ্ডিয়ান ইনটেলেকচুয়াল এসেছেন। চ্যাটার্জি, সিনিয়র ফেলোশিপে

কাজ করছেন। তা ভাবছিলাম, তুই যদি এই শনিবারে ব্লাইণ্ড ডেট নিস।"

হলো না। ভিভিয়ান অনুরোধ রাখতে পারলে না। তার অন্য এক বয় ফ্রেণ্ড আগাম ছুটো ডেট নিয়ে রেখেছে।

ওলগা ছাড়বার পাত্রী নয়। বললে, "দাঁড়াও, ক্রিশ্চিনকে ফোন করি। ক্রিশ্চিনের চোখ ছুটো দেখলে তোমার কথা বন্ধ হয়ে যাবে!"

ডায়াল ঘুরিয়ে আবার ওলগা আরম্ভ করলে, "ক্রিশ্চিন, এখানে একজন ইণ্ডিয়ান ইনটেলেকচুয়াল···"

ক্রিশ্চিন রাজী হয়ে গেল।

সেই প্রথম ডেটিং। ওলগার এক বয় ফ্রেণ্ড এসেছিল—জুলিয়ান। ওদের বিরাট গাড়ি। পিছনে আমার বাঁটকুল সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ফোকসওয়াগেন।

ক্রিশ্চিন রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল আমাদের জন্যে। আমরা গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়লাম। ওলগা এবার বান্ধবীর হাত ধরে বললে, "ক্রিশ্চিন, তোমাকে যে কী সুন্দর দেখাচ্ছে কী বলবো—প্রতিদিন ছুধে স্নান করছো নাকি?"

এইখানেই ওলগা আমাদের আলাপ করিয়ে দিল। "হাই অনি, এই হচ্ছে সেই সুবিখ্যাত ক্রিশ্চিন—দি সুইটেস্ট গার্ল লিভিং!"

আমাকে দেখিয়ে বললে, "হাই ক্রিশ্চিন, অনি আমাদের মতো অ্যাভারেজ পার্সন নয়—দেশের জন্যে, সভ্যতার জন্যে চিন্তা করে। দেখছো না ওর চোখগুলো—ইণ্ডিয়ার পাঁচ হাজার বছরের সুখ-দুঃখ ওখানে টলমল করছে।"

"তুমি কবি হতে পারতে ওলগা," আমি বলে ফেলি।

"পারতে মানে? ওলগা তো কবি। অন্তঃসত্ত্বা হয়ে বয় ফ্রেণ্ডের উদ্দেশে সেই যে কবিতাটা লিখেছিলে—দি লাস্ট রাইড অন এ ফোর্ড ফ্যালকন!"

ক্রিশ্চিনের মুখের দিকে তাকিয়ে তার কথা শুনছিলাম। এবার আমাদের চার চোখের মিলন হলো। তারপর ক্রিশ্চিন আমার গাড়িতে এসে চড়লো।

ওলগা আমার দিকে চোখ টিপে বললে, "আচরণবিধিতে যেন গোলমাল না হয়!"

আমরা সবাই যাচ্ছি মাইল আটেক দূরে এক লেকের ধারে। প্রথম ডেটিং-এ একটু নার্ভাস বোধ করছি। কিন্তু ক্রিশ্চিনের মধ্যে কোনো জড়তা নেই। সে বললে, "ধন্যবাদ আপনাকে, এই সুযোগটা দেবার জন্যে।"

"ধন্যবাদের কী আছে। এদেশে একলা পড়ে থাকি, সুতরাং আপনার ডেটিং-এর সুযোগ পেয়ে ধন্য মনে করছি। আপনি যে অল্প নোটিশে আসতে পেরেছেন এইটাই সৌভাগ্য।"

আরও বললাম, "যদি আমার আচরণে কোনো ভুল হয়ে যায় আমাকে ক্ষমা করবেন।"

"কিছু চিন্তা করবেন না। আপনাদের দেশে কি ডেটিং নেই?"

"মোটেই না।"

"বলেন কি, তাহলে আপনাদের দেশে যুবক-যুবতীরা উইকএণ্ডে কী করে?"

একবার ভাবলাম বলি, আমাদের দেশে যুবক-যুবতী নেই। বালক-বালিকা আছে, তারপরই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। আমাদের দেশে যৌবনের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু প্রথম দিনই ইণ্ডিয়াকে গালাগালি করা ঠিক হবে না। অন্য কিছু উত্তর দিতে হবে।

কিন্তু কী বলা যায়? মহা ফ্যাসাদে পড়া গেল তো! ছোঁড়া-ছুঁড়ীরা শনি-রবিবারেও তো বাড়িতে চুপচাপ বসে থাকে। সমর্থ মেয়েরা ছাদে এবং তৈরি ছোঁড়ারা রাস্তায় জমিয়ে আড্ডা মারে। অভিভাবকদের চোখের আড়ালে তারা কী করে আমি বলতে পারব না।

ক্রিশ্চিন জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, ডেটিং আমার কেমন লাগে। কিন্তু ওর সঙ্গেই আমার প্রথম ডেটিং শুনে অবাক হয়ে গেল। বললে, "আমি সম্মানিত বোধ করছি।"

ড্রাইভ করতে করতে ওর দেহের মিষ্টি প্রসাধনের গন্ধ পাচ্ছি। ওর মিনি ফ্রক হাঁটুটাকেও পুরোপুরি ঢাকতে পারছে না। বললাম, "আমাকে একটু শিখিয়ে পড়িয়ে নিও।"

"কোনো চিন্তা কোরো না। ডেটিংটা আর কিছু নয়—অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটু মেলামেশা, এই পর্যন্ত। তবে ডেটিং-এরও ধাপ আছে। একদিনে সব কিছু পাওয়া যায় না। একটা অলিখিত আইন আছে, প্রথম ডেটিং-এ এই পর্যন্ত, তার পরের ডেটিং-এ আরও একটু এগনো যায়, এই রকম।"

আমি বোকার মত ট্রেনিং নিয়ে যাচ্ছি। ক্রিশ্চিন বললে, "কিন্তু মনে রেখো, এটাও এক ধরনের খেলা। খেলার মধ্যে জেতবার এবং হারিয়ে দেবার চেষ্টা চলেছে।"

আমরা শেষ পর্যন্ত নির্জন বনের ধারে সেই রেস্তোরাঁয় হাজির হয়েছিলাম। ওলগা আমাদের টেবিলে জায়গা দিয়ে বললে, "তোমাদের দেরি দেখে তো ভাবছিলাম অন্য কোথায় চলে গেলে নাকি!"

বললুম, "তোমাদের ফোর্ডের সঙ্গে কী করে পেরে উঠবে আমার বেবি ফোকসওয়াগেন?"

ওলগা বললে, "অন্য কথা থাক। সব ভুলে এখন আনন্দ করো। কেমন লাগছে, ক্রিশ্চিন!"

"গ্রেট!" উত্তর দিলে ক্রিশ্চিন।

"আর তুমি?"

"অন টপ অফ দি ওয়ার্লড। মনে হচ্ছে পৃথিবীর মাথায় চেপে বসে আছি!"

"তাই তো হওয়া উচিত!" বললে ওলগা।

কিন্তু মাইরি বলছি, সবাই এখানে কেন খুশী তা আমার মাথায় ঢুকছে না। এই খুশী-খুশী ভাবের মধ্যে কোনো গভীরতা নেই। এই আনন্দ চামড়ার ওপর চিড়িং বিড়িং করছে, হৃদয়ে ঢুকছে না। কিন্তু এতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় কলম্বাস আবিষ্কৃত এই মহাদেশের নাগরিকদের, আর বলতে হয় "গ্রেট, ওয়াণ্ডারফুল, নেভার হ্যাড ইট সো গুড্।"

এবার গল্পগুজব শুরু হলো। অন্য টেবিলের জোড়েরা অনেকেই নাচতে শুরু করেছে।

জুলিয়ান ছোকরা দেখলাম ওলগার উরুর ওপর নিজের হাতখানা রেখেছে। মাঝে মাঝে ফ্রিজে রাখা তাজা মাখনের মতো মাংসটার স্পর্শসুখ অনুভব করছে। চারদিক থেকে আনন্দের, হাসির এবং পরিতৃপ্তির আওয়াজ ভেসে আসছে।

আমার মনে হলো, আমিও অবশেষে সাবালক হয়ে উঠেছি। আমার যা খুশী করার একটা আইনগত অধিকার অবশেষে জন্মেছে।

ক্রিশ্চিনকে বললাম, "কী খাবে বলো ?"

ও একটা শেরী নিলে, আমি নিলুম একটা হুইস্কি। তারপর গল্পগুজব শুরু হলো।

ইণ্ডিয়া থেকে এসে মহাপাতকের কাজ করেছি। প্রেমের দোলনায় বসেও প্রিয়াকে ইণ্ডিয়ার সমস্যার কথা বলো। এখনও বাল্যবিবাহ চলে কিনা জানাও। বাল্যবিবাহের দেশ থেকে এসেছ অথচ এখনও তোমার বিয়ে হয়নি কেন ? না, টেগোরের সেই নৌকাডুবি গল্পের মতো—বউ চিনতে পারনি ?

ওলগা তার বয় ফ্রেণ্ডকে নিয়ে নাচতে শুরু করলে। আমি নাচতে জানি না, তাই চুপচাপ বসে আছি।

ক্রিশ্চিন বললে, "নাচ শিখে নিও। না হলে ডেটিং পুরো এনজয় করতে পারবে না।"

মেয়েমানুষের সান্নিধ্য মানেই এতদিন একটা অশ্লীল ছবি ভেসে

উঠতো। পতিতালয়ে পতিত না হয়েও অবিবাহিত পুরুষ যে নারী-সান্নিধ্য উপভোগ করতে পারে সেটা এবার বুঝছি।

ওলগা ইতিমধ্যে জমে গিয়েছে। ক্রিশ্চিন সেটা বুঝেই আমাকে বললে, "ওদের একটু একা ছেড়ে দেওয়া ভাল! ওরা ডিনারের পর হয়তো জোড়ে কোথায় যেতে চাইবে। ওদের চরে খেতে দাও।"

ডিনারের বিল চুকিয়ে দেওয়ার পরে ওলগাকে তাই বললাম। সে একটু কিন্তু-কিন্তু করতে লাগল। হাজার হোক আমাদের ব্লাইণ্ড ডেট, ওর নিজেরও একটু দায়িত্ব রয়েছে। কিন্তু আমাদের কাছে মুক্তি পেয়ে মনের আনন্দে জুলিয়ানের সঙ্গে নিভৃত অভিসার উপভোগ করতে চলে গেল।

আমি এবার ফাঁপরে পড়ে গেলাম। ক্রিশ্চিনকে নিয়ে কী করা যায়, কিছুই বুঝি না। কথাবার্তার বিষয় ফুরিয়ে আসছে। কর্মযোগ থেকে কামসূত্র পর্যন্ত সমস্ত ভারতীয় জ্ঞানের নির্যাস ইতিমধ্যেই ক্রিশ্চিনের মাথায় ঢুকে গিয়েছে। ও ইণ্ডিয়ার রহস্যের মধ্যে ঢুকতে চায়। কিন্তু খুকুরাণী, আমি ক্ষুধার্ত বিদেশী। তোমার রহস্যের মধ্যে আমাকে একটু উঁকি মারতে দাও!

ক্রিশ্চিনকে পাশে বসিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিলাম। গাড়ি ছুটে চলেছে। গুন গুন করে বাংলা গান ধরেছি আমি।

ক্রিশ্চিন নিজে থেকেই বললে, "বাঃ, সুরটা বেশ ভাল লাগছে, তুমি গেয়ে যাও।"

চান্স পেয়ে আমি প্রাণের সুখে গেয়ে চলেছি, এখানে বাংলা গানের ভুল ধরতে কেউ আসছে না। পাশ দিয়ে তীব্র বেগে একটা গাড়ি বেরিয়ে গেল; আমার নার্ভগুলো ধাক্কা খেয়ে স্টিয়ারিং-এর দিকে নজর দিতে বললে। হাইওয়েতে ফষ্টিনষ্টি করলে একেবারে গুঁড়ো হয়ে যেতে হবে।

গান থামিয়ে বললাম, "আমাদের পোয়েট টেগোর অনেক গান লিখেছেন।"

"হাউ সুইট", বললে ক্রিশ্চিন।

বললাম, "সুইট! বুড়ো মরে গিয়েও আমাকে জ্বালাচ্ছেন। সব সময় শুধু নিজেকে উঁচু করতে বলছেন। ওঁর কথামতো ওপরের সিঁড়ি ভাঙতে আরম্ভ করলে কোটি কোটি ইণ্ডিয়ান কোনকালে সশরীরে স্বর্গে পৌঁছে যেতো।"

ক্রিশ্চিন বললে, "অনি, তুমি গানটা আবার গাও।"

আমি গাইতে আরম্ভ করলাম।

তার পরই ফ্যাসাদ হলো। ক্রিশ্চিন জিজ্ঞেস করলে, "এবার মানে বলো।"

লজ্জায় পড়ে গেলাম। আমি গাইছিলাম, "শুধু তোমার বাণী নয় গো হে বন্ধু হে প্রিয়, মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও।"

বললাম, "পোয়েট বলছেন, শুধু সুইট ওয়ার্ড নয়, হৃদয়ে ফ্রম টাইম টু টাইম একটু টাচ দিও।"

খিল খিল করে হেসে উঠলো ক্রিশ্চিন। "খুব প্রেমিক কবি তো!"

আমি বললাম, "ইস্কুলে পড়েছিলাম, এই প্রেম ভগবানের সঙ্গে।"

"কাম অন্! আর ইউ কিডিং?" খিল খিল করে হেসে উঠলো ক্রিশ্চিন।

তারপর কোন সময়ে আমরা ওর বাড়ির কাছে এসে পড়েছি। আমি দরজাটা খুলে দিতে যাচ্ছিলাম। ক্রিশ্চিন বাধা দিলে। আমার খুব কাছে সরে এসে বললে, "আমি ওলগার কাছে কৃতজ্ঞ, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার জন্যে।"

আরও একটু এগিয়ে আমাদের দু'জনের মধ্যের শূন্যস্থান পূর্ণ করবার চেষ্টা করে আমি উত্তর দিলাম, "আমিও ওর কাছে কম কৃতজ্ঞ নই।"

ক্রিশ্চিন এবার বললে, "তোমার প্রথম ডেট একটু স্মরণীয় হয়ে থাকা উচিত। আমি বলেছিলুম, ডেট-এর অন্তরঙ্গতা ধাপে ধাপে বাড়ে।"

"আমি তো সে কথা মনে রেখেছি। আই হোপ, তোমার অসুবিধের কোনো কারণ হইনি।"

"মোটেই না। আমি শুধু তোমায় বলতে চাই, ক্রিশ্চিন নামক একটি বালিকাকে তুমি একবার চুম্বনের অধিকার অর্জন করেছ।"

বলা বাহুল্য, সেই অধিকার সঙ্গে সঙ্গে কার্যকরী করেছিলাম। এবং তারপর দ্রুতবেগে গাড়ি চালিয়ে নিজের ফ্ল্যাটে চলে এসেছিলাম।

ফিরে এসেও ন্যাকামি করেছিলাম, টেলিফোনে ধরলাম ক্রিশ্চিনকে।

"হ্যালো," ওধার থেকে ক্রিশ্চিনের স্বর ভেসে এল।

"ভাবলাম, তুমি ঘুমিয়ে পড়বার আগে তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।"

ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছে ক্রিশ্চিন। বললে, "ইউ সেন্টিমেন্টাল ইণ্ডিয়ান!"

টেলিফোনটা নামিয়ে দিয়ে আমি অনেকক্ষণ হা-হা করে হেসেছি। সেন্টিমেন্টাল! রাজবল্লভ সাহা সেকেণ্ড বাই লেনের অনির্বাণ চাটুজ্যে সেন্টিমেন্টাল! খুব চিনেছ বাবা। তা বাপু আমি কিন্তু কিছু বলছি না। আমি এই দুনিয়াতে ক'টা দিনের জন্যে এসেছি, একটু ভোগ করতে চাই, আমার পাঁচটা ইন্দ্রিয়—ওই যে বিদ্যাসাগরের বোধোদয়ে যে পাঁচটি কলের নাম লেখা আছে—তাদের একটু সুখ, একটু আয়েস দিতে চাই। তার জন্যে আমার মন বলছে, যা দরকার তা করতে হবে।

বেশ লাগছিল। কেমন মজায় ফুলের বনে ভ্রমর হয়ে চালাচ্ছিলাম। অথচ দেখুন না, এইমাত্র এরোপ্লেনের সীটে বন্দী হয়ে রয়েছি। অমন সুখের সোনার দেশ ছেড়ে আবার ফিরে চলেছি ইণ্ডিয়াতে। যেখানে পঞ্চাশ কোটি লোক, তা সত্ত্বেও প্রতি দেড় সেকেণ্ডে একটা করে বাচ্চা হচ্ছে; কিন্তু সেখানকার গাছ ফল দেয় না, মেঘ বৃষ্টি আনে না, গোরুর বাঁট শুকনো। অথচ একটা নয়, তিন তিনটে সিংহকে আমরা অত আদর করে মাথায় তুলে রেখেছি।

বেচারা কুমারের বাবা কী এসব বুঝবেন! কুমারের সঙ্গে একটু

আড্ডা জমানো যাক।

নাঃ, কুমার ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি, তার কারণ, ওর মুখের মধ্য দিয়ে আমি ওর বাবার মুখ দেখতে পাচ্ছি। ওর ভারতীয় বাবা আর আমেরিকান মা যেন সন্তানের ওপর নিজেদের ছাপ রেখে দেবার জন্যে রেশারেশি করেছেন। কেমন দুধে-আলতায় মেশানো গায়ের রঙ—আমেরিকান মায়ের দান। আর ওর মুখখানা ওর বাবাই বসিয়ে দিয়েছে, শুধু নাকটা যেন আরও ছুঁচলো। ওর মায়ের নাকটা আমি খুব কাছ থেকেই দেখেছি। আর ওর নামটা যখন শুনেছিলাম, আমি নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। বেণীমাধব আমাকে বলেছিলেন, "ওর নামটা একটু আলাদা—ভারতকুমার রায়। ওর বন্ধুরা ওকে আদর করে ডাকে—ইণ্ডিয়া রয়। আমরা বলি কুমার।"

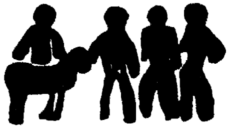
"তুমি ওকে কী নামে ডাকবে?" বেণীমাধব জানতে চেয়েছিলেন।

মনে মনে বলেছিলুম, রক্ষে করুন, ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়া সব সময় আমি কিছুতেই করব না, ওসব ভুলতে পারলেই বাঁচি। সরল ছোকরার মত মুখ করে বললাম, "কুমার বলেই ডাকব ওকে, ভারি সুন্দর নাম।" মনে মনে আরও বলেছিলাম, ওর বোনকে কুমারী বলে ডাকব, যদিও তার নাম রঞ্জাবতী।

পাগল! না হলে বেণীমাধব রায় এই এতকাল বিদেশে থেকে মেয়ের নাম রাখেন রঞ্জাবতী।

শুনুন, আমার সঙ্গে বেণীমাধবের পরিচয়ের কথা। নিউটন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ক্যামপাসে বেণীমাধবের জয়জয়কার। প্রফেসর রায় বলতে সবাই শ্রদ্ধায় গদ্‌গদ। যেখানে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যত পুরস্কার আছে, তার অনেকগুলোই বেণীমাধবের গলায় ঝোলানো হয়ে গিয়েছে। সেবার খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট সাহেব কী একটা সম্মানের স্বীকৃতিস্বরূপ বেণীমাধবকে হোয়াইট হাউসে ডিনার দিলেন।

বেণীমাধব ক্যামপাসে ফিরে আসবার কয়েকদিন পরেই আমাকে খবর পাঠিয়েছিলেন।



সেই প্রথম সাক্ষাতের দিনটা আমার চোখের সামনে ভাসছে। পেটে একটু বেশী শ্যাম্পেন পড়লেও সেদিনকার একটা কথাও ভুলিনি। ক্যামপাসের উত্তরে যেদিকে পাহাড়টা উঁচু হয়ে গিয়ে আবার নেমে এসেছে নদীর বুকে, তারই একটা টিলার ওপর বাড়ি করেছেন বেণীমাধব। এই শহরের কেষ্টবিষ্টুরা এই অঞ্চলেই বাড়ি করেন—আমাদের কলকাতার আলিপুরের মতন।

'ভাগীরথী'—বাড়ির নাম দেখেই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এই দশ হাজার মাইল দূরেও ভাগীরথীর পাবলিসিটি দিচ্ছেন ভদ্রলোক। কিন্তু ভদ্রলোক জানেন না, ভগীরথ যে-গঙ্গাকে আবাহন করে শাপদগ্ধ সগর-সন্তানদের উদ্ধার করেছিলেন, সেই ভাগীরথী এখন মৃতপ্রায়। এখন সেখানে কেবল পাঁক—প্রাণপ্রবাহ স্তব্ধ।

বাড়ির কাছে এসে যে একটু ভয়-ভয় করছিল না এমন নয়—হাজার হোক, পৃথিবীর বিজ্ঞানী মহলের একজন দিক্‌পালের সঙ্গে দেখা করতে চলেছি আমি।

বাড়ির নাম যেখানে লেখা আছে, সেখান থেকে বাড়িটা বেশ খানিকটা দূরে। চারদিকে নানারকম গাছে ছেয়ে রয়েছে। মধ্যে একটা লনও নজরে পড়ল। সবুজ ঘাসের কার্পেটে মোড়া লন।

আমি দোতলা বাড়িটার সামনে থমকে দাঁড়ালাম। বাড়িটা পুরোপুরি কাঠের—মার্কিন মুলুকে এটা খুবই স্বাভাবিক। ভগবান এঁদের

যা অরণ্যসম্পদ দিয়েছেন—তা খেয়ে শেষ করতে এখনও কয়েক শো বছর লেগে যাবে। তাই কাঠ এরা দরাজ হাতে খরচ করে।

আমি ওইখানে দাঁড়িয়ে রাজবল্লভ সাহা সেকেণ্ড বাই লেনের সেই শ্যাওলাপড়া ভাঙা বাড়িটার কথা ভাবছিলাম, যার বাইরের দিকে চাঁদসির ক্ষত চিকিৎসালয়, আর ভিতরে ছাপাখানায় একটা বৃদ্ধ ট্রেড ল মেশিনের বুকে হাঁটু দিয়ে কাজ বার করা হচ্ছে! ওই ভাঙা বাড়িতেই, যেখানে এখনও খাটা-পায়খানা, সেখানেই জন্ম নিয়েছিলেন আজকের প্রথিতযশা অধ্যাপক বেণীমাধব রায়।

আমি কলিং বেল টিপতেই যে দীর্ঘদেহী ভারতীয় দরজা খুললেন, তিনিই যে বেণীমাধব তা বলার প্রয়োজন রাখে না। মাথার চুলগুলো এর মধ্যে বেশ সাদা হতে আরম্ভ করেছে।

বাবা বলতেন, যারা প্রতিভাবান, যারা ইন্দ্রিয়কে আস্কারা দেয় না, তাদের চোখ জ্বল জ্বল করে। দেখলাম, বেণীমাধবের চোখ দুটো খাঁটি একশো পাওয়ারের বাতির মতই জ্বলছে। তারই সামনে মোটা ফ্রেমের চশমা। একটা ড্রেসিং গাউনে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন তিনি, হাতে একটা সিগার।

এবার আমাদের চার চোখের ইণ্টারভিউ হলো। তিনি বললেন, “তুমিই অনির্বাণ! এসো।”

বেণীমাধব পরম স্নেহে এমনভাবে আমার হাত চেপে ধরলেন যে, আমার দিক থেকেও একটু ন্যাকামো না করলে খারাপ দেখায়। তাই টিপ করে প্রণাম করে বসলাম ওঁকে।

মন্ত্রের মতো ফল হলো। তিনি আমাকে স্নেহভরে কাছে টেনে নিলেন, যেন আমি তাঁর কত আপনজন।

আমি এবার ওঁর ড্রয়িং-রুমে ঢুকে পড়েছি। ড্রয়িং-রুমের দেওয়ালগুলো বইতে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। শুধু এক কোণে দেখলাম, ঘোমটা দেওয়া এক বিধবার অস্পষ্ট ছবি।

আমার দৃষ্টি যে ছবিটার দিকে পড়েছে, বেণীমাধব তা বুঝলেন। আমি ওদিকে এগিয়ে গিয়ে তাকিয়ে রইলাম। বেণীমাধব শান্তভাবে বললেন, "মা'র কোনো ফটো ছিল না। তখন আমাদের দিন চলাই দায় ছিল, ফটো তোলার কথা মাথায় কখনও আসেনি।"

বেণীমাধব কোনোরকম ইমোশন প্রকাশ না করেই গম্ভীরভাবে বললেন, "এখানে এসে প্রায়ই মায়ের কথা ভাবতাম। একটা ছবি থাকলে কত যে ভাল হতো। কিন্তু সে আর কোথায় পাওয়া যাবে? শেষে নিজেই একদিন কাগজ কলম নিয়ে বসলাম। নিজের স্মৃতি থেকে মাকে এইটুকু উদ্ধার করতে পেরেছি।"

আমি এসেছি বেণীমাধব রায়ের কাছে মার্কিন মুলুকের খবরাখবর নিতে, আর বেণীমাধব আরম্ভ করলেন, রাজবল্লভ সাহা লেনে তাঁর মায়ের কথা।

বেণীমাধব আমাকে পাড়ার লোক ভেবেই বোধহয় জিজ্ঞেস করলেন, "ছবিটায় মায়ের মুখ দেখে তোমার কী মনে হচ্ছে বলো তো?"

"মনে হচ্ছে, মুখটা ফ্যাকাশে, রক্তহীন।"

শান্তভাবে বেণীমাধব বললেন, "আমি তা হলে সফল হয়েছি। আমার মায়ের অ্যানিমিয়াগ্রস্থ মুখটাই আমার আজও বার বার মনে পড়ে যায়।"

আমি আর কিছু বললাম না। তোমার মা যে ঠোঙা তৈরি করে আর রাঁধুনীগিরি করে তোমাকে মানুষ করবার চেষ্টা করেছিল, তা রাজবল্লভ সাহা লেনের কোনো ছেলের জানতে বাকি নেই। দুনিয়াতে আরও কত লোকের মা মুড়ি ভেজে, বাসন মেজে, বাটনা বেটে ছেলে মানুষ করেছে, কিন্তু তাদের কথা কেউ আলোচনা করে না, কারণ তাদের ছেলেরা নিউটন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর বেণীমাধব রায় হতে পারেনি; বড় জোর তারা কেরাণী হয়েছে।

ছবির মতো সাজানো ঘরটা। একটা বোতাম টিপে দিতেই

ম্যাজিকের মতো সামনের দেওয়াল অনেকটা সরে গেল। আমরা ঘরের মধ্যে থেকেও প্রকৃতির অনেক কাছে সরে এলাম। ঘরের এক কোণে রঙীন টেলিভিশন, অন্য দিকে স্টিরিও সঙ্গীতের ব্যবস্থা রয়েছে।

এতদিন পরে নিজের পাড়ার লোক পেয়ে বেণীমাধব একটু উতলা হতে আরম্ভ করেছেন। কেমন করে, কোথা থেকে কথা পাড়বেন, বুঝে উঠতে পারছেন না।

আমি দেখলাম, বেণীমাধবকে একটু কব্জা করা দরকার। তাই সোজা-সুজি বললাম, "আপনার অনুগ্রহেই আমার বিদেশ আসা সম্ভব হলো।"

"আমি অনুগ্রহ করার কে? তোমার টাকা দিচ্ছেন বেনহিল ফাউণ্ডেশন। তুমি তার পরিবর্তে মানুষের মঙ্গলজনক কিছু করবে, ভারতবর্ষের মুখোজ্জ্বল করবে। আমি তো নিমিত্ত মাত্র।"

আমেরিকায় এসে দুনিয়ার মঙ্গল করবার জন্য ইণ্ডিয়াতে কত ছোঁড়াছুঁড়ি যে উঁচিয়ে আছে, তা আর বেণীমাধবের কাছে ভাঙলাম না। আমার কাজ গুছিয়ে নেওয়াটাই বড় কথা। বেণীমাধব রায় ব্যক্তিগত-ভাবে আগ্রহ না নিলে, বেনহিল ফাউণ্ডেশনের ঘুম হচ্ছিল না, রাজবল্লভ সাহা সেকেণ্ড বাই লেনের অনির্বাণ চাটুজ্যেকে গ্রান্ট দেওয়ার!

বেণীমাধবের টেবিলে একটা কাঠের ট্রেতে কিছু আঙুর ও আপেল রাখা ছিল। আমার দিকে আদর করে ট্রে এগিয়ে দিলেন, "খাও না ততক্ষণ। সীডলেস আঙুর—এর বিচি হয় না।"

বেণীমাধব বললেন, "তোমাদের বাড়িতে প্রথম আঙুর খেয়েছিলাম মনে আছে। সরস্বতী পুজোর দিনে তোমার বাবা আমাকে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। পুষ্পাঞ্জলির পরে প্রসাদ দিলেন। বললেন, "মা'র আশীর্বাদ লাভ করো, তাঁর বরপুত্র হও।" কৃতজ্ঞ বেণীমাধব বললেন, "তোমার বাবার মতো পরম ধার্মিক ও আদর্শবাদী সংসারে বিরল। তিনিই আমাকে আশা ও উৎসাহ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, লড়ে যাও। দুঃখকে একদিন হার মানতেই হবে তোমার কাছে।"

হারাণচন্দ্রের স্মৃতিচারণে মুখর হয়ে উঠেছেন বেণীমাধব, আর আমি চুপচাপ তা উপভোগ করছি।

বাপের পরিচয়ে ছেলের পরিচয়ের এই ভারতীয় সিস্টেমটা আমার খুব মিষ্টি লাগে। বাপের আমি কি পুত্র হয়েছি সে তো আর সঙ্গে সঙ্গে হিসেবে ধরা পড়ছে না, লোকে ধরেই নিচ্ছে ল্যাংড়া আমের বাচ্চা ল্যাংড়া আমই হবে।

বেণীমাধব বললেন, "রাজবল্লভ সাহা লেনের খবর কী?"

উত্তর এড়িয়ে গিয়ে বললাম, "চলছে, চলে যাবে।"

বেণীমাধব এখন নস্টালজিয়ায় ভুগছেন। বললেন, "আমাদের বাড়ির সামনে একটা চানাওয়ালার দোকান ছিল। এখনও আছে?"

"হ্যাঁ, এখনও আছে। শুধু আরও একটু নোংরা হয়েছে। জানেনই তো, ধুলো ঝাড়া, ঝুল পরিষ্কার করা এগুলোর জন্যে আমেরিকান রাশিয়ান কোনো গভর্মেণ্টই আমাদের এইড দেয় না। এবং এইড না পেলে আমরা নিজেদের গামছাটা পর্যন্ত কাচতে রাজী নই!"

আমি ভেবেছিলাম বেণীমাধব হাসবেন, বা আমার ব্যঙ্গের তারিফ করবেন। কিন্তু ওঁর মুখে সে রকম কোনো ভাব দেখলাম না। হঠাৎ নোটবইটা বার করে বললেন, "কুমারকে এই দিকটা সম্বন্ধেও কিছু বলতে হবে। যুগ যুগ ধরে নরককুণ্ডে থেকে থেকে মানুষ তাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্যবোধ হারিয়ে ফেলেছে। পরিচ্ছন্নতা জিনিসটা তাদের কাছে মূল্যহীন হয়ে উঠেছে। দোষটা মানুষের নয়, পরিবেশের।"

বেণীমাধব বললেন, "আর সেই নেড়োবিস্কুটের দোকানটার কী হলো? এক পয়সায় তিনখানা ঝাল-বিস্কুট দিতো।"

"ঠিক আছে। তবে এখন তিন পয়সায় একখানা ঝাল-বিস্কুট পাবেন। জানেন তো স্বাধীন ভারতের ছুটি প্রধান কীর্তিস্তম্ভ হলো জনস্ফীতি ও মুদ্রাস্ফীতি।"

বেণীমাধব এবারেও বিচলিত হলেন না। বেশ নিশ্চিন্তে বললেন,

"শরীর অসুস্থ হলে মানুষের হাত-পা, চোখের কোল ফোলে, তার জন্যে চিকিৎসা করাতে হবে।" ভারতবর্ষ যে অনিবার্য অধঃপতনের খাদে পড়েছে তা তিনি বিশ্বাস করতে রাজী নন।

বেণীমাধবের মনে আজ বেশ আনন্দ হয়েছে। অনেক দিন পরে এমন একজনকে পেয়েছেন, যে তাঁকে তাঁর কৈশোর ও যৌবনের দিন-গুলিতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আমার যে এই সব সেন্টিমেন্ট ভাল লাগে তা মোটেই নয়—কিন্তু বুঝতেই পারছেন, বেণীমাধবের জোরেই এই ফেলোশিপ পেয়েছি, না হলে আমেরিকান এয়ারপোর্টের লোকগুলো আমাকে এদেশে ঢুকতেই দিত না।

বেণীমাধব বললেন, "দাঁড়াও, তোমার জন্যে একটু কফি করে আনি।"

আমি দেশী কায়দায় বললাম, "আপনি কেন কষ্ট করতে যাবেন!"

"এখানে তো চাকর-বাকর নেই। সমাজের দরিদ্র স্তরকে এরা প্রায় মুছে ফেলেছে—এইটাই এই সভ্যতার সবচেয়ে শ্রদ্ধার দিক, বুঝলে অনির্বাণ। সুতরাং তুমি নিজেই তোমার চাকর, নিজেই তোমার রাঁধুনী।" একটু থেমে বেণীমাধব বললেন, "আমার স্ত্রী একটু বেরিয়েছেন একটা কমিটি-মিটিং-এ। শ্বশুরবাড়ির লোক দেখলে উনি খুব আনন্দ পেতেন।"

কফির কাপ হাতে করে বেণীমাধব বললেন, "আমার বড় ভুল হয়ে গেল। তোমাকে রাজবল্লভ সাহা লেনের কয়েকটা ফটো তুলে আনতে বললে হতো। কুমারও নিজের চোখে দেখতে পারতো। আমি বুঝতে পারতাম, চল্লিশ বছরে কতখানি পাল্টেছে।"

আমার নিজেরও তো ইচ্ছে করছে বেণীমাধবের একটা ফটো তুলে রাজবল্লভ সাহা লেনের পুরনো লোকদের পাঠাই। তারা দেখুক সেই মুখচোরা আধময়লা শার্ট পরা বেণীমাধব, যার মা ঠোঙা তৈরি করতেন, সে কত পাল্টেছে।

বেণীমাধবের এখন অতীতে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে। বর্তমানের

নিরাপদ আশ্রয় থেকে কষ্টকর অতীতে মাঝে মাঝে ফিরে যাওয়াটা অনেক সাকসেসফুল লোকদের এক ধরনের বিলাস।

বেণীমাধব বললেন, "ছোটবেলাটা বড় কষ্টে কেটেছে। আমার মা'র ঘরে একটা এমব্রয়ডারি করা লেখা ছিল—'ওরে, মেঘ দেখে কেউ করিস নে ভয়, আড়ালে তার সূর্যি হাসে, হারা শশীর হারা হাসি অন্ধকারেই ফিরে আসে'।"

আমি মনে মনে বললাম, মেঘ কেটে গিয়েছে তোমার, সুতরাং লেকচার দাও।

বেণীমাধব বললেন, "তোমার বাবার কথাও ভুলব না। তিনিই আমাকে বলেছিলেন, তুই পড়াশোনায় ভাল, তোর প্রতিভা রয়েছে, তুই আশা ছাড়িস না। তুই এই গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে যা।"

মনে মনে পিতৃদেবকে থ্যাঙ্ক ইউ দিলাম। ভাগ্যে কাজটা করেছিলেন, তাই আমার পক্ষে ফরেনে আসার সুবিধে হলো।

বেণীমাধব বললেন, "ভারতবর্ষে অত দারিদ্র্যের মধ্যেও মানুষ কত মহৎ থাকতে পারে, তা পৃথিবীর লোকরা জানে না।"

আমি আর থাকতে পারলাম না। বললাম, "গরীবরা সৎ, গরীবরা সরল, গরীবরা গোবেচারা এসব বাংলা নাটক-নভেলেই লেখা হয়। গরীবরাও কম তাঁদড় নয়, চান্স পেলে ঘাড়ে ঘুণ ধরিয়ে ছাড়বে।"

বেণীমাধব যে অনেক দিন ভারত ছাড়া, এটা আমার মনে থাকা উচিত ছিল। দেখলাম বেণীমাধব চমকে উঠলেন। ওঁর মনে যে খুব কষ্ট হয়েছে, তা ওঁর চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারছি। দূর ছাই, এ কি ফ্যাসাদ বলুন তো। এতো বোকা এবং কচি মন নিয়ে কী করে তুমি পরীক্ষায় ফার্স্ট হলে, বিদেশে পাড়ি দিলে, সেখানে নাম করে কেষ্ট-বিষ্টু হলে?

ভদ্রলোককে খুশী করবার জন্যে বললাম, "মানে, গরীবদের কী এমন দোষ বলুন? গভরমেন্টই ওদের জাত নষ্ট করছে। গভরমেন্টের জ্বালায়

ইণ্ডিয়ার সব যেতে বসেছে।”

আ মলো যা, খুশী হওয়া দূরের কথা, বেণীমাধব আরও দুঃখ পাচ্ছেন। বললেন, “আমি যে-ভারতবর্ষকে জানি, সেখানে আমাদের সব দুঃখের জন্যে ব্রিটিশ গভরমেন্টকে দোষী করতাম। কিন্তু এখন তো ভারতবর্ষ স্বাধীন। এখন তো···”

এই সব ন্যাকা ন্যাকা কথা শুনলে পিত্তির অবস্থা কেমন হয়, বুঝতেই পারছেন। কিন্তু বেণীমাধব ভারতপ্রেমে পড়েছেন। তিনি বলতে লাগলেন, “আমার ছেলেমেয়েদের আমি বলি, পৃথিবীতে ভারতবর্ষ একটাই আছে। ভারতবর্ষের মানুষ বহু শতাব্দীর দুর্ভোগেও তাদের মনুষ্যত্ব হারায়নি। ভারতবর্ষ যেদিন আবার ঘুম ভেঙে উঠে দাঁড়াবে, সেদিন পৃথিবীর সভ্যতা আবার নতুন আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।”

আমি চুপচাপ কফি খাচ্ছি আর মাঝে মাঝে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছি।

বেণীমাধব বললেন, “ভারতবর্ষের সব আছে, শুধু একটু আগুন প্রয়োজন। যেদিন প্রাণের আগুন জ্বলে উঠবে, ভারতবর্ষের পাঁচ লক্ষ গ্রামে সেদিন কী আশ্চর্য কাণ্ড হবে, তা কল্পনাও করা সম্ভব নয় পৃথিবীর লোকদের।”

আমি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, শেষ কবে ভারতবর্ষে তিনি গিয়েছেন। কিছু না হয়, কনফারেন্স, এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম এ-সব তো লেগেই আছে।

শুনে অবাক হলাম, “সেই যে এসেছি, আর যাইনি। এতগুলো বছর কোথা দিয়ে কেটে গেল খেয়াল হয়নি।”

আরও হয়তো কথা হতো, কিন্তু গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। একটু পরেই ঘরের মধ্যে ঢুকলেন এক বিদেশিনী মহিলা ও এক ছোকরা —যার মুখের ওপর বেণীমাধবের ছাপ রয়েছে।

এঁরা দুজনেই হৈ হৈ করে ইংরিজীতে কিচির-মিচির করছিলেন, কিন্তু

ঘরের মধ্যে আমাকে দেখেই থমকে দাঁড়ালেন। বেণীমাধব বললেন, "অনির্বাণের কথা তোমাদের বলছি। কিন্তু তার আগে মিটিং-এর কী হলো বলো?"

ভদ্রমহিলা বললেন, "ডার্লিং, আমাদের অ্যাসোসিয়েশন থেকে যে-টাকা তোলা হবে, তার অর্ধেক ইণ্ডিয়াতে পাঠানো হবে ঠিক হলো। আমরা বাঁকুড়ার কাছে একটা গ্রামের ছেলেমেয়েদের অ্যাডপ্ট করবো—তাদের ইস্কুলের টিফিন খরচটা এখান থেকেই পাঠানো হবে।"

ছেলেটা বললে, "জানো বাবা, টিফিনে মাত্র এক গেলাশ দুধ আর দু' পিস মাখন-রুটি দেওয়া হবে। তাতে কি হবে বলো তো?"

ভদ্রমহিলা বললেন, "দুধের সঙ্গে আমরা লিকুইড ভিটামিন ও প্রোটিন দেবো।"

ছেলে সন্তুষ্ট হলো না। বললে, "ওগুলো আমি খেয়ে দেখেছি। আমার মোটেই ভাল লাগে না।"

বেণীমাধব বললেন, "আমরা যখন ইস্কুলে পড়তাম, তখন আমার খুব ইচ্ছে করতো ঘুগনি খেতে। কিন্তু কোথায় পাব পয়সা?"

"বাবা, হোয়াট ইজ ঘুগনি?" ছেলেটার প্রশ্নে আমি আর একটু হলে ফিক করে হেসে ফেলতাম।

বেণীমাধব বললেন, "ডিলিসাস, এখনও আমার মুখে লেগে রয়েছে। এক ধরনের ডালের প্রিপারেশন। অনেকটা কারি টাইপের, সঙ্গে থাকে নারকোল, লঙ্কা এবং লেবুর রস।"

"ইউ মিন লাইম", ছোকরা জানতে চাইলে।

বেণীমাধব বললে, "হ্যাঁ। আমি যে দেশে থাকতে কোনোদিন রান্নাঘরে ঢুকিনি, না হলে কী করে ঘুগনি তৈরি হয় তোমাদের বলতাম।"

আমি দেখলাম এই সুযোগ। বললাম, "যদি অনুমতি দেন, এখানে একদিন ঘুগনি তৈরির চেষ্টা করতে পারি। আমরা একবার কয়েক বন্ধু মিলে বাড়ির ছাদে ঘুগনি করেছিলাম।"

ভদ্রমহিলা আমার প্রস্তাবের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। "তুমি যে-কোনোদিন চলে এসো, এখানে বসে বসে রান্না করবে, আমরা সবাই তোমার অ্যাসিসটেন্ট হবো।"

বেণীমাধবও আনন্দে রাজী হলেন, তবে সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "আমাদের পাড়ায় যে লোকটা ঘুগনি বিক্রি করতো, তার নাম ক্ষেত্র। পৃথিবীতে ঘুগনির জন্যে নোবেল প্রাইজ থাকলে ক্ষেত্রকেই দিতে হতো।"

বেণীমাধব এবার বললেন, "ঘুগনি তো রান্না হবে, কিন্তু এখনও তোমাদের আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়নি। অনির্বাণ, তুমি এতক্ষণ নিশ্চয় বুঝেছ আইলীন আমার স্ত্রী এবং এই তালগাছের মতো বালক, স্যরি যুবক, আমার পুত্র। ওর নাম আমি ওর মাকে রাখতে বলেছিলাম। কিন্তু ওর মা বলেছিলেন, আমিই রাখছি, কিন্তু তুমি আমার হয়ে একটা ভাল ইণ্ডিয়ান নাম পছন্দ করে দাও। আমি তাই বলেছিলাম, ভারতকুমার। আমি ওকে ডাকি কুমার বলে। আমার স্ত্রী ওকে আদর করে ডাকেন, ইণ্ডি বলে।"

বাবা-মা'র কথাবার্তা কুমার খুব মজার সঙ্গে শুনছিল। সে বললে, "জানেন মিস্টার চ্যাটার্জি, একবার কথা হয়েছিল, আমার নাম রাখা হবে ইণ্ডিয়া রয়। কিন্তু শেষে মা'র খেয়াল হলো স্টেটসে ইণ্ডিয়ান বলতে রেড ইণ্ডিয়ান বোঝায়।"

মিসেস রায় ইংরিজীর মধ্যে দু' একটা বাংলা কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আটকে যায়। মাঝে মাঝে চেষ্টা করতে গিয়ে হোঁচট খান—তখন আবার ফিরে আসেন ইংরিজীতে। কুমারের অবস্থা প্রায় এক। সেও কিছু কিছু বাংলা জানে। সে যখন বাংলা বলতে আরম্ভ করে তখন বেশ মজা হয়, মাঝে মাঝে তোতলামি এসে যায়।

কুমার বললে, "আপনি তো বেঙ্গল থেকে এসেছেন। আপনি ইন দ্যাট সাহা লেন আমাদের···আমাদের···হোয়াট ডু ইউ সে···" বেণীমাধব কথাটা বলতে যাচ্ছিলেন···কিন্তু কুমার বললে···"প্লিজ ডোণ্ট

ড্যাডি···আমি এখনই মনে করে ফেলবো”···এবার মাথা চুলকে “ইয়েস ···পৈতৃক বাড়ি।”···এবার পকেট থেকে নোটবই বার করে কি একটা দেখে বললে, “স্যরি···বাড়ি নয়। পৈতৃক ভিটে, কথাটা বাবা সেদিন ইউজ করেছিলেন, আমি লিখে নিয়েছি। ওটা দেখেছেন?”

বাবা বললেন, “কুমার, উনি তার পাশেই থাকেন।”

এবার দু'জনের আনন্দ ধরে না। আমাকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবার জন্যে কুমার তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু বেণীমাধব বললেন, “মিস্টার চ্যাটার্জি অনেকদিন নিউটনে থাকবেন এবং প্রায়ই এখানে আসবেন, সুতরাং তোমাদের কৌতূহল নিবৃত্তির সময় পাবে।”

সেদিন মিসেস রায় ও কর্তা দু'জনেই আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসেছিলেন। মিসেস রায় বললেন, “আমার মেয়ে রঞ্জার সঙ্গে দেখা হলো না তোমার। আলাপ হলে খুশী হতো সে।”

কর্তা বললেন, “এখানে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো? হলেই আমাকে বলবে। তোমার বাবা আমাকে খুব ভালবাসতেন, তোমাদের বাড়িতে কতদিন মুড়ি আর চা খেয়ে এসেছি।”

যেন প্রাচীন যুগের তপোবনে ফিরে গিয়েছি। দূর থেকে গাছের সারির মধ্য দিয়ে ওঁদের দিকে ফিরে তাকিয়ে মনে হলো ঋষিদম্পতি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আমাকে আশীর্বাদ করছেন।

এই আশীর্বাদ জিনিসটা আমার মোটেই ভাল লাগে না—তার মানে ইন্দ্রিয়ের চাকাগুলোয় ব্রেক মেরে বসে থাকো, নিজের মনের মধ্যেও একটু ঋষি-ঋষি ভাব আনো। তা আমি কোন্ দুঃখে আনতে যাবো বলুন তো?

আমি আমার ফোকসওয়াগেন চালিয়ে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরছি, হঠাৎ জিয়াযুর রহমনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। জিয়া আমাদের ঢাকার ছেলে; একেবারে কট্টর বাঙাল এবং কট্টর বাঙালীও বলতে পারেন। জিয়াকে গাড়িতে তুলে নিলাম। জিয়া বললে, “কেমন আছেন দাদা?”

“চলে যাচ্ছে ভাই।”

জিয়া বললে, "দেশ থেকে আজ আমসত্ত্ব এসেছে, আপনাকে এক-খানা দেবো।"

"আমাকে আবার ওইটুকু জিনিস থেকে দেবে কেন?"

"না হয় দেশটাই ভাগ হয়েছে, তা বলে বাঙালী দাদাকে আমসত্ত্ব না দিয়ে খাবো? আমাকে কী ভেবেছেন?"

এই হচ্ছে জিয়ার দোষ। দিনরাত শুধু বাঙালী বাঙালী করছে। বাঙালীর কিসে ভাল হয়, বাঙালী কেমন করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, তার জন্যে বিছানায় শুয়েও ভাবছে। বোকার মরণ। ও আমাকেও জিজ্ঞেস করে, আমি হু হাঁ করে যাই। গেল গেল করেও সাত আট কোটি বাঙালী বেঁচে রয়েছে। আমি তাদের জন্যে ভাবতে বসে নিজের সুখটা নষ্ট করি কেন? প্রত্যেক বাঙালীকে একটা করে নয়া পয়সা দিতে গেলে যা টাকা লাগবে, তা আমি বাবার জন্মে রোজগার করতে পারবো না। অনাবৃষ্টি, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ব্যবসায়িক মন্দা, কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড, ভেজাল, রায়ট সত্ত্বেও বাঙালীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। শুধু স্বদেশ কেন? বিদেশেও কী হচ্ছে দেখুন না। এই প্রফেসর নিমাই মুখুজ্যে যেভাবে টুলটুলের মনোরঞ্জনের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন, তাতে যদি সফল হন তাহলে আরও বাঙালী বাড়বে।

জিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, "কেমন চলছে?"

"এমনি মন্দ নয় দাদা। তবে জেনিকে নিয়ে বিপদে পড়ে যাচ্ছি। জেনি বন্ধুবান্ধবদের বলে বেড়াচ্ছে. সে আমার সঙ্গে 'স্টেডি' হচ্ছে, আর কারও ডেট নেবে না।"

"তা বৌমা হিসেবে মন্দ হবে না! রাঙা টুকটুকে বউ পেয়ে তোমার মায়ের মন গলে যাবে", আমি বলি।

জিয়া বললে, "মেমসায়েবের সঙ্গে ডেট-ফেট করা যায়, করতে ভালও লাগে, ওদের চুমু খাওয়ার স্টাইলও ভাল। কিন্তু তাই বলে বিয়ে করি কী করে?"

"মানে তোমার কেসটা বুঝে গিয়েছি। তুমি সারা জন্ম বিছানাতে শুয়ে ইংরিজী বলতে রাজী নও।"

"ঠিক ধরেছেন দাদা, আপনার প্রতিভা অন্য রকমের! জেনিকে এখনই বোঝাতে গিয়েছিলাম, আমাদের প্রেম আরও ঘন করবার সময় এখনও আসেনি।"

আমি বললাম, "জেনির পিছনে অন্য ছোঁড়া লেলিয়ে দাও। ডিভাইড এণ্ড রুল!"

জিয়া কথা শুনলে না, ওর অ্যাপার্টমেন্টের সামনে আমাকে দাঁড় করিয়ে আমসত্ব এনে দিলে। বললে, "আপনার কাজ কেমন চলছে?"

"বুঝতেই তো পারছো, বিষয়খানা বড় গোলমেলে—সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।"

"আমি তো সব ব্যাটাচ্ছেলেকে এখানে বলে বেড়াচ্ছি—বাঙালী ছাড়া আর কেউ এই সাবজেক্টের ওপর সুবিচার করতে পারবে না। নিজেদের স্বার্থে দাঙ্গা সৃষ্টি করলো ইংরেজরা, আর তাতে বলি হলো বাঙালী জাত! সুতরাং এর হিস্ট্রি বাঙালীদের পক্ষ থেকে আপনাকেই লিখে যেতে হবে।"

যে দু'চারজন বাঙালী এখানে ছড়িয়ে রয়েছে তাদের খবরাখবর নেবার দায়িত্ব জিয়াই নিয়েছে। জিয়া বললে, "ইন্দ্রাণী সেনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে আপনার। ওঁর স্বামীর একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিন না!"

"বিরহ সহ্য হচ্ছে না বুঝি?" আমি বলি।

"আরও একটা বাঙালী বাড়তো", জিয়ার শুধু ওই চিন্তা। জিয়াকে কিছু বললাম না। শুধু মনে মনে ভাবলাম, এতোই যদি বিরহ, তাহলে ওজন বাড়ছে কী করে? এই ক'মাসে ইন্দ্রাণীর তো বেশ গতর বেড়েছে!

বাড়ি ফিরে এসেই ফোন করলাম। বললাম, "শ্রীমতী সেন বেশ বিরক্ত হয়েই টেলিফোন ধরেছেন দেখছি। ছেলে-ছোকরারা খুব

জ্বালাতন করে বুঝি ?"

ওদিকে ইন্দ্রাণী দেবী যে হেসে গড়িয়ে পড়ছেন, তা আমি ফোনেই বুঝতে পারছি। "জানেন, এখানকার আমেরিকানগুলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে বলতে অজ্ঞান।"

"কপাল করে এসেছেন, আপনারা! শাড়ির রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যে এরা পাগল। অথচ ধুতি সম্বন্ধে এখানকার যুবতীদের কণামাত্র আগ্রহ নেই।" আমি উত্তর দিই।

"ইয়ারকি নয়! তবে এখানকার ইণ্ডিয়ান ছোঁড়ারা আমাদের মুখ ডোবাচ্ছে। হা-ঘরের মতো ডেট চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ আমাদের দেশের ট্রাডিশন কী—সেখানে স্ত্রী ছাড়া আর সবাই-এর সঙ্গে পুরুষরা মা, মাসি, বোনের সম্পর্ক পাতায়।"

"আপনার আদর্শ দেখে সবাই তা বুঝতে পারছে।"

"আপনিও কোন কোন মেয়ের সঙ্গে ডেট করছেন, খবর পাচ্ছি!"

এরপর পিত্তি জ্বলে উঠল। কথা শেষ করে ফোন নামিয়ে দিয়ে ভেবেছিলাম ব্যাপারটা। আমার মাথায় দুষ্টবুদ্ধি একবার চাপতে আরম্ভ করলে আর সামলাতে পারি না। ইন্দ্রাণী সেনকে ফ্রেমে রেখে তার পাশে বেশ কয়েকটা ছোঁড়ার কথা ভাবতে লাগলাম। ওই যে নারীবিশারদ কার্ল এখন আমার পাশে বসে আছে, ওর কথা ভেবেছিলাম। মেয়েদের কোন্ সুইচ কেমন ভাবে টিপলে কী ফল হয়, সব মুখস্থ তার। দেবো নাকি লেলিয়ে—ইন্দ্রাণী দেবীর একটু পরীক্ষা হয়ে যাবে। নাঃ, আমার মাথায় তখন আরও চিন্তা খেলছে। জিয়ার কথাটাই আমার মাথায় ঘুরছিল।

জিয়া যে ধরনের মানুষ তাতে শুধু লোভ দেখিয়ে কাজ হবে না। বাঙালী-উদ্ধারের স্বপ্নে বুঁদ হয়ে আছে। সুতরাং একটু আদর্শবাদের ছোঁয়াচ দিতে হলো। বললাম, "আমার একটা অভিযোগ আছে। ইন্দ্রাণী সম্বন্ধে তুমি কোনো চিন্তা করছো না। বিদেশে বাঙালী মেয়ে

একলা পড়ে রয়েছে, একটু দেখাশোনা করো।"

জিয়ার বাঙালী হৃদয় এবারে কেঁদে উঠলো।

"নিশ্চয়ই দাদা, এ তো আমাদের করতেই হবে। আমাদের বোনের মতো।"

আমি ধমক লাগিয়েছিলাম জিয়াকে। "নিজের বোন নয়—পরের বোন!"

জিয়া একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। তখন কানে কানে বিষ ঢেলেছিলাম। "তোমার এমন সুপুরুষ চেহারা দেখলে আমার হিংসে হয়। শোনো, ইন্দ্রাণী দেবী তো তোমার জন্যে পাগল!"

"কী বলছেন দাদা, হতেই পারে না।"

"জিনিসটা যেন তুমি আমি ছাড়া আর কেউ না জানে। তোমার টানা-টানা চোখের প্রশংসা পর্যন্ত শুনেছি!"

"অসম্ভব দাদা।"

একবার এগিয়ে গিয়ে দেখো। তবে বুদ্ধি করে কৌশল করে এগোতে হবে। তুমি ওর স্বামীকে এখানে আনাবার জন্যে উঠে-পড়ে না লেগে ওর সঙ্গেই আস্তে আস্তে সম্পর্কটা গড়ে তোলো। পাঁচ ডলার বাজি রইল—তুমি পারবে। না হলে, এই পাঁচ ডলার তোমার!"

জিয়াকে এর পরে দেখেছি। চোখমুখের ভাব পাল্টাতে আরম্ভ করেছে। বুঝেছি ও লেগে আছে। মিসেস সেন কিন্তু আমেরিকান ছেলে ও মেয়েদের কাছে পশ্চিমী সভ্যতার গুষ্টি উদ্ধার করে চলেছেন।

কিছুদিন পরে জিয়া সব কথা বলতে চায় না। কিন্তু মিসেস সেনের ঘরে ওকে প্রায়ই দেখা যায়। ওদের সুবিধে, দু'জনেই এক বিষয়ে পড়াশোনা করছে—সুতরাং ওদের দেখা-সাক্ষাৎ হওয়াটাই স্বাভাবিক।

মিসেস সেন বলেছেন, "জিয়ায়ুর রহমান ছেলেটিকে আগে আমার কেমন কেমন লাগতো। আপনাকে বলতে লজ্জা নেই, পাকিস্তানীদের সম্পর্কে আমার খুব খারাপ ধারণা। ওদের জন্যেই রিফিউজি হয়ে চলে এসেছিলেন বাবা। কিন্তু এই ছেলেটা রবীন্দ্রনাথের ভক্ত। ভাল গান গায়। বলছে, এখানে একটা রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য করবে।"

সুতরাং ইন্দ্রাণীকে নাচতে হবে। সেই সঙ্গে গানগুলোও টেপরেকর্ডে তুলতে হবে। সেই জন্যেই ওর আগ্রহ। আর জিয়া ইন্দ্রাণীর কথা উঠলেই একটু কান লাল করে ফেলে। চেপে ধরতে আমার কাছে স্বীকার করেছে, "আপনি ঠিকই বলেছিলেন দাদা।"

এরোপ্লেনের সীট থেকে ঘাড় ফিরিয়ে একবার ইন্দ্রাণীকে দেখলাম। এই যে ইন্দ্রাণী আমাদের সঙ্গে ফিরে যাচ্ছে—এর কারণও জানি আমি। জিয়াকে পাঁচটা ডলার দিতে হয়েছে। ব্যাপারটা যে শেষপর্যন্ত অ্যাক্সিডেণ্টে দাঁড়াবে তা ভাবতে পারেনি। মার্কিন মুলুকে অ্যাবরসনের অনেক খরচ। তাই সময় থাকতে থাকতে পালাতে হচ্ছে ইন্দ্রাণীকে।

কিন্তু জিয়ার সেকি অনুশোচনা। জিয়া বললে, "একি করলাম দাদা। মাতৃভাষার সুযোগ নিয়ে আমি একজন বাঙালীর ক্ষতি করলাম। লোকে কী করে আমাকে বিশ্বাস করবে। আমার সংস্কৃতি, আমার ভাষা থেকে নিজের প্রবৃত্তিকে উচ্চস্থান দিলাম! আমাকে ক্ষমা করবেন দাদা। কলকাতার লোকদের বলবেন, সব পূর্ব পাকিস্তানীই আমার মতো নীচ নয়। তারা সত্যিই আদর্শকে মেনে চলে।"

কী অপ্রস্তুতই যে হতে হয়েছিল আমাকে। যা করেছিস, বেশ করেছিস। ভুলে যা। তা নয়, আদর্শের জন্যে দুঃখ। সেন্টিমেন্টাল

বাঙালী জাতটার কিছু হবে না—ইণ্ডিয়া এবং পাকিস্তান দু' জায়গাতেই ঠকে মরবে।

এবার বরং ইন্দ্রাণীর সঙ্গে একটু কথা বলে আসি। নিষ্ঠাবতীর পদস্খলন কাহিনী নাম দিয়ে একটা গল্প লিখতে ইচ্ছে করছে।

ইন্দ্রাণী আমাকে দেখেই সীট থেকে উঠে এল। আমরা টয়লেটের সামনের জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বললাম। এখনও মচকাচ্ছে না ইন্দ্রাণী। বললাম, "আপনার বিরহ এবার তাহলে শেষ হচ্ছে।"

একটা লাজুক হাসি দিয়ে শ্রীমতী বললেন, "ও দমদমে আসবে, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো।"

আমি আবার নিজের সীটে ফিরে এলাম। হাসি চেপে রাখতে আমার কষ্ট হচ্ছিল।

কতক্ষণ নিজের চিন্তায় বিভোর হয়ে বসেছিলাম খেয়াল করিনি। হঠাৎ বুঝলাম আমাদের বোয়িং প্লেনের মানুষগুলো এবার ঘুমিয়ে পড়ছে। অনেকেই সীটগুলো একটু পিছনে ঠেলে নিয়েছে। কুমারও দেখলাম হাত দুটো কোলের ওপর রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে পড়ছে সেই দিনের কথা, যেদিন ঘুগনি রান্নার জন্যে আবার বেণীমাধবের বাড়িতে গিয়েছিলাম। মিসেস রায় এই বয়সেও উৎসাহে ও উদ্দাম আবেগে টগবগ করছেন। আমাকে সবাই মিলে ওয়েলকাম করলে। প্রফেসর তখন বেরিয়ে গিয়েছেন ল্যাবরেটরিতে। মিসেস রায় বললেন, "এসো এসো।"

মিসেস রায় ইংরিজীতেই কথা বলছেন। কিন্তু দুঃখ করলেন, "আমার স্বামীর খুব ইচ্ছে আমি ভাল করে বাংলা শিখি। কিন্তু তেমন সুযোগ পাইনি। কয়েকটা কথা ওঁর কাছ থেকে পিক-আপ করেছি।"

মিসেস রায় গম্ভীর, ভাল মানুষ। বললেন, "উনি যখন প্রথম এ-দেশে এলেন তখন আমি এখানকার অফিস সেক্রেটারি। বিলেতে দু'বছর কাটিয়ে উনি এদেশে এলেন ভাগ্যান্বেষণে। ওঁর মুখের দিকে

তাকিয়েই বুঝেছিলাম, উনি একদিন আরও বড় হবেন। উনি আমাকে হতাশ করেননি। নিউটন বিশ্ববিদ্যালয় ওঁর প্রাণ। বেশ কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু একমাত্র নিউটনের ডঃ হাইন ওঁকে ডেকে নিয়েছিলেন। সে কথা আমার স্বামী ভোলেননি। নাম হবার পরে স্ট্যানফোর্ড এবং কলম্বিয়া থেকেও ডাক এসেছে—কিন্তু উনি যাননি।”

সেদিন শুনেছিলাম আরও কথা। বেণীমাধবের সাধনার কাহিনী। কেমন করে বড় হবার স্বপ্ন তাঁকে পাগল করে রেখেছিল। কেমন করে প্রতিভা ও পরিশ্রম তাঁকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু বেণীমাধব বোধহয় কোথাও নিঃসঙ্গ। এখনও তিনি নিজের দেশের কথা ভুলতে পারেননি। উনি এখনও সব সময় ভারতবর্ষের কথা ভাবেন। যদিও আইনত তাঁর আর ভারতবর্ষের কথা ভাববার প্রয়োজন নেই। কারণ তিনি এখন মার্কিন নাগরিক।

সে-গল্পও শুনেছি মিসেস রায়ের কাছে। পরম কৃতজ্ঞতায় বেণীমাধব বিয়ে করেছিলেন এই বিদেশিনীকে। আইলীন না হলে হয়তো বেণীমাধব কোথায় ভেসে যেতেন। এই বিদেশে বেণীমাধবকে তিনি সাহস, সান্নিধ্য ও সেবা দিয়েছেন। স্বামীকে আরও বড় হতে উৎসাহ দিয়েছেন। মিসেস রায় আমাকে বলেছেন, “আপনাদের দেশে মানুষ এত গরীব কেন?”

তা আমি কী করে জানবো! গরীবদের নিয়ে চিন্তা করাটা তো এক ধরনের বিলাসিতা। ঠাকুর্দা গরীব ছিল, বাপ গরীব ছিল, ওরা নিজে গরীব, ওদের ছেলে, নাতি, নাতির নাতি সবাই গরীব হবে—এই তো দুনিয়ার নিয়ম বলে জানি। দু' চারটে নেতা বাজারে আরও নাম করার জন্যে গরীবদের মাথায় তোলে।

মিসেস রায় ও তাঁর স্বামী সময় পেলেই এসব নিয়ে মাথা ঘামান। তোমরা বাপু ভুল করছো। দুনিয়াতে আরও মজার জিনিস আছে, যা

নিয়ে মাথা ঘামালে ভাল করতে।

মিসেস রায় বললেন, "আমার শাশুড়ি বিধবা অবস্থায় কীভাবে আমার স্বামীকে মানুষ করেছিলেন জানেন তো? আমার স্বামী তাই কখনও নিজেকে ভারতবর্ষের গরীবদের থেকে আলাদা ভাবতে পারেন না।"

উনি এখনও একান্তে বিষণ্ণ হয়ে থাকেন। অথচ কিছুতেই ভারতে যাবেন না। উনি বলেন, "আমি আমার পিছনের ব্রীজ পুড়িয়ে চলে এসেছি। আমার ফেরা চলবে না।" এর কারণ অবশ্য বেণীমাধবকে জিজ্ঞেস করবেন না।

মিসেস রায় বললেন, "আজও আমার সেই দিনটা মনে আছে যেদিন উনি মার্কিন নাগরিকত্ব গ্রহণ করলেন। জানেন তো এদেশের নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্যে কত লোক লালায়িত; পাওয়াটাও বেশ শক্ত। কিন্তু উনি অনেকদিন ব্যাপারটা পিছিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর বেশ অসুবিধা হতে লাগল। আমার বড় ছেলের তখন পাঁচ বছর বয়স। কলেজের ল্যাবরেটরিতে তখন মিলিটারি বিভাগের অনেক কাজ আসছে। কিন্তু আইন অনুযায়ী এইসব গোপন কাজ কোনো বিদেশীকে দেওয়া যাবে না।

"উনি দিনের পর দিন ধরে ভেবেছেন। একদিন রাত্রে দেখলাম আমার স্বামী নিশ্চল পাথরের মতো আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি ওঁর পিছনে এসে দাঁড়ালাম। বললাম, 'বড় কষ্ট হচ্ছে বুঝি?'

"উনি আমাকে কাছে টেনে নিলেন। 'আইলীন, তুমি আমাকে ভুল বুঝছো না নিশ্চয়। আমি একটু আলো চাইছি। আমি পথ দেখতে পাচ্ছি না।'

"আমি বললাম, 'তোমার মন যা চায় তাই করবে। আর তুমি যা করবে আমি তাই মাথা পেতে নেবো। তুমি যদি চাও, আমি

রাজবল্লভ সাহা লেনে গিয়ে উঠতে রাজী আছি।'

"উনি বললেন, 'কী আশ্চর্য! আমি যদি এই কাগজটায় সই করি তাহলে দূরে বহু দূরে সাগর মহাসমুদ্র পেরিয়ে ঐ যে দেশ, যে দেশে আমি জন্মগ্রহণ করেছি, তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। আমি বিদেশী হয়ে যাবো।' "

মিসেস রায় বললেন, "আমি ওঁকে একলা রেখেই আবার ফিরে এসেছিলাম। আমি বুঝেছিলাম, উনি একা থাকতে চাইছেন। আরও অনেক পরে যখন ঘরে ফিরে এসে কোনো কথা না বলেই উনি শুয়ে পড়েছিলেন তখনই বুঝেছিলাম উনি মার্কিন নাগরিক হতে মনস্থ করেছেন। আমি জানতাম, তাছাড়া উপায় নেই। কারণ সবার ওপরে আমার স্বামীর বৈজ্ঞানিক সাধনা। নিজের প্রতি কর্তব্য, নিজের দেশের প্রতি কর্তব্য আর সমস্ত মানুষের প্রতি কর্তব্য এর মধ্যে কোনটা সবার ওপরে যাবে সে সম্বন্ধে তাঁর মনে আর কোনো দ্বিধা নেই।"

মিসেস রায় বলে চললেন, "বৈজ্ঞানিক গবেষণার এমন সুযোগ তিনি আর কোথাও পাবেন না। এর জন্যে যা প্রয়োজন তার কোনো কিছুরই অভাব হবে না যদি তিনি আমেরিকার সঙ্গে পুরোপুরি মিশে যান। আমার স্বামীর কাছেই অন্য সময়ে শুনেছি, পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ নিজেকে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। কোথায় অন্ন, কোথায় বস্ত্র, কোথায় একটু সুখ খুঁজতে গিয়েই জীবনের মেয়াদ ফুরিয়ে যায়। সামান্য কয়েকজন এরই মধ্যে দেশের কথা ভাবেন—যে দেশে তাঁরা জন্মেছেন, যে দেশ তাঁদের পরিপুষ্ট করেছে। আরও সামান্য কিছু লোক আছেন যাঁরা সমস্ত মানুষের কথা ভাবেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘে, ইউনেসকোতে মাইনে-করা লোক দিয়ে এখন গোটা পৃথিবীর কথা ভাবতে হয়। যে ক'জন এখনও সমস্ত মানুষের কথা নিঃস্বার্থ ভাবে ভাবতে পারেন তাঁরা হয় কবি না হয় বৈজ্ঞানিক।"

"বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বেণীমাধব যে সাধনা করছেন, তা সমস্ত মানুষের

জন্যে। যদি তা সফল হয়, তাহলে পৃথিবীর সব মানুষই উপকৃত হবে।

মিসেস রায় বললেন, "তবু যেদিন আমার স্বামী শপথ গ্রহণ করলেন, সেদিন ভুলবো না। হাত তুলে সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতে হয়। ওঁর হাত আর উঠতে চায় না। যেন পক্ষাঘাতে ওর ডান হাতটা অবশ হয়ে গিয়েছে, ওটা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। অন্য কেউ লক্ষ্য না করলেও, আমার বুঝতে দেরি হয়নি, ওঁর হাতটা উঠতে দু'এক সেকেণ্ড দেরি হয়েছিল।"

সেই রাত্রে প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক বেণীমাধব রায় নাকি ছোট ছেলের মতন কেঁদেছিলেন। স্ত্রীর সান্ত্বনা তাঁকে শান্ত করতে পারেনি। তিনি বলেছেন, "আইলীন, আজ থেকে আমি আর ভারতীয় নই।" আইলীন বলেছেন, "কেন তুমি ভারতীয় নও? ভারতীয় তুমি. আমেরিকায় নতুন দেশ করেছো।" চোখের জল মুছে বেণীমাধব বলেছেন, "তুমি আমাকে ক্ষমা করো আইলীন। তুমি ভাবছো আমি অকৃতজ্ঞ। এই দেশ যদি আমাকে আশ্রয় না দিতো, সুযোগ না দিতো তাহলে আজকের বেণীমাধব রায় সৃষ্টি হতো না। আমার ঋণের শেষ নেই। আমি জানি ভারতবর্ষ আমাকে কিছু দেয়নি। আমার মা কী কষ্ট পেয়ে কেমনভাবে মারা গেছেন তুমি তো জান, আইলীন। তবু আমার মা এবং আমার ভারতবর্ষকে আলাদা করে দেখতে পারি না। জান, আমার মায়ের কত কি দিতে ইচ্ছে করতো আমাকে, কিন্তু কোথায় পয়সা পাবেন?"

আইলীন আমাকে বলেছিলেন, "তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, না, সেই রাত্রে আমার স্বামী আমাকে বলেছিলেন, কথা দাও তুমি অন্তত আমাকে ভুল বুঝবে না। তুমি অন্তত মনে রাখবে ভারতবর্ষকে আমি কত ভালবেসেছিলাম। আমি শুধু কথা দিইনি, নিজেও প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, ওঁর সঙ্গে আমিও ভারতবর্ষকে ভালবাসবো।"

তখন থেকেই একটু অন্য মানুষ হতে আরম্ভ করেছিলেন বেণীমাধব। মাঝে মাঝে এখনও বলেন, "কেন আমি নিজের দেশকে ত্যাগ করেছি বলো তো? টাকার জন্যে? অনেক সুখের জন্যে? এই পাহাড়ের ওপর বাড়ির জন্যে?"

এই সব কথা শুনলে ইণ্ডিয়ানরা গলতে আরম্ভ করবে। বেণীমাধব সম্পর্কে উচ্চ ধারণা হবে। আহা, বড় কষ্ট পেয়েছে বেচারা। মায়ের চিকিৎসা করাতে পারেনি, বিদেশে পাকেচক্রে নিজের নাগরিকত্ব ত্যাগ করেছে। ভারতবর্ষের পঞ্চাশ কোটি লোক নাগরিকত্ব রেখেও তো খুব দেশোদ্ধার করছে। মেয়েরা ভাববে, আহা লোকটা একটা ভাল বউ পেয়েছে, মানুষটাও বেশ। আমার কিন্তু এসব কিছুই মনে হচ্ছে না। আমার বুকের ভিতরটা শুকনো, অত সহজে আমি ভিজি না। আমি যে এসব গল্পটল্প শুনছি তার কারণ আমাকে এক বছরের ফেলোশিপটা আর এক বছর টানতে হবে। এখানে কত সুন্দর সুন্দর মেয়ে, চরে খাবার কত সুযোগ, এসব ছেড়ে রাজবল্লভ সাহা সেকেণ্ড বাই লেনে মোটেই ফিরে যাবার ইচ্ছে নেই। তা ছাড়া রঞ্জাবতীর সঙ্গে আলাপ হবার লোভ আছে। আইলীনও দেহটাকে রেখেছে ভাল। বেণীমাধব বোকাসোকা গোবেচারা দেখতে হলেও বউ পছন্দটা বেশ ভালই করেছেন। ভাবুক গোবেচারা লোকগুলো সাধারণত এই ব্যাপারে বেশ চালু হয়।

আমি তো ঘুগনি রাঁধলাম প্রফেসর রায়ের বাড়িতে। মিসেস রায় আমার সহকারিণীর কাজ করলেন। আর কুমারও খুব আগ্রহ দেখালে। একটু পরেই রঞ্জাবতীও এলেন। রঞ্জাকে দেখে আমার তো মাথা ঘুরে যাবার অবস্থা। কার্ল আমাকে বলতো, মিশ্রণ না হলে সৌন্দর্য খোলে না, বুদ্ধি ও শক্তি বিকশিত হয় না। যে দেশে যত মিশ্রণ সে দেশে ততো সৌন্দর্য। তা বেণীমাধবকন্যার ক্ষেত্রে কার্লের আইনটা খেটে যাচ্ছে। আমাদের বাঙালী মতে রঞ্জা অনেক লম্বা। সোনালী চুলগুলো মায়ের

কাছে পেয়েছে, কিন্তু চোখ দুটো একেবারে মেড ইন ইণ্ডিয়া। ওর মুখে, দেহে, হাবেভাবে কিন্তু মার্কিন ভাবটাই প্রবল। বাংলা কিছুই জানে না, নিজের কলেজ ও ডান্সিং পার্টি নিয়েই আছে।

রঞ্জা বললে, "আপনিই মিঃ চ্যাটার্জি! বাবা তো ক্যালকাটার কাউকে দেখলে পাগল হয়ে যান। আমাদের অ্যানথ্রপলজিতে বলে, নিজের কালচার ছেড়ে অন্য কোনো শক্তিশালী কালচারের মধ্যে এসে পড়লে মানুষের এমন হয়।"

রঞ্জা জিজ্ঞেস করলে, "ইণ্ডিয়াতে শুনি মেয়েরা নাকি সারাদিনই রান্নাঘরে থাকে।"

আমি বললাম, "কথাটা মিথ্যে নয়।"

রঞ্জার মা বললেন, "ওকে এখন বিরক্ত কোরো না, রান্নায় মনের কনসেনট্রেশন দরকার। ইণ্ডিয়াতে রান্নাও দেবসেবার একটা অঙ্গ।"

আমাদের রান্না শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেণীমাধব ফিরে এলেন। হাসতে হাসতে বললেন, "তোমার এই ঘুগনির জন্যে একজন ছাত্র ডক্টরেট পেয়ে গেল। আজ ডক্টরেটের পরীক্ষা ছিল। শেষের ছোকরাটিকে আরও কিছু প্রশ্ন করা উচিত ছিল, কিন্তু ঘুগনির কথা ভেবে সহজেই ছেড়ে দিলাম। বেশী প্রশ্ন করলে ফলাফল কী হতো জানি না।"

চায়ের সঙ্গে ঘুগনি খেতে আরম্ভ করে, বেণীমাধব ছেলের মতামত চাইলেন। ছেলে বললে, "গ্রেট! যদিও একটু ঝাল লাগছে।"

বেণীমাধব বললেন, "আমাদের এক প্রফেসর বলেন, ঝাল সহ্য করবার ক্ষমতা না থাকলে ইণ্ডিয়া আবিষ্কার করা যায় না। কারণ একটু গ্রামের মধ্যে ঢুকলেই লঙ্কার রাজত্ব।"

কুমার বললে, "এই ঘুগনি কথাটার উৎপত্তি কোথা থেকে? এটা সংস্কৃত নাকি?"

ছেলেটা আমাকে বিপদে ফেলবে দেখছি। ওর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে

আগ্রহের শেষ নেই। বেণীমাধব আমাকে বললেন, "আমি অনেকদিন দেশছাড়া, নতুন যুগের কিছুই জানি না। আমার খুব ইচ্ছে তুমি সপ্তাহে দু'তিনদিন এসে ওর সঙ্গে গল্প করো, ওকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বলো। আমি তোমার কষ্টটা কিছু ডলার দিয়ে পুষিয়ে দেবো। মনে করবে প্রাইভেট ট্যুশনি করছো। আমি এক সময় ছেলে পড়িয়েছি, মা'র যখন খুব অসুখ তখন প্রাইভেট ট্যুশনির টাকাটাই আমাদের ভরসা।"

আমি দেখলুম মন্দ কী? কিছু বাড়তি ডলার পেলে শনি-রবিবারের ডেটিংগুলো একটু ভালভাবে করা যায়। ডেটিং-এর সব ভাল, শুধু এই খরচটুকু ছাড়া। আমেরিকান মেয়েগুলো সুযোগ পেলেই মোটা টাকা খসিয়ে দেয়। ক্রিশ্চিন সেদিকে একটু বিবেচক। কিন্তু রোজ খেলে সন্দেশেও অরুচি হয়। শুধু ক্রিশ্চিনে মন ভরে না। আমি আরও কত মেয়ের সঙ্গে আলাপ করেছি। মেয়েরা আমায় পছন্দ করে। কারণ মেয়েদের আমি নির্লজ্জভাবে তোয়াজ করতে পারি। আমার মনের মধ্যে যাই থাক, আমি বাইরে এমন নারী-প্রশস্তি করতে পারি যে মেয়েরা গলে যায়। প্রকৃতিই আমাকে এই শক্তি দিয়েছেন, না হলে বিদ্যেসাগর মশায়ের বই থেকে যে পঞ্চেন্দ্রিয়ের কথা শিখেছিলাম তাদের সেবা করতে পারতাম না।

আমি এর মধ্যে সমাজসেবাও করে যাচ্ছি। তবে ত্যাগ আমার আসে না। মলমূত্র ছাড়া আর কিছুই আমি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ত্যাগ করি না। আমি এমন সমাজসেবা করি যাতে অন্যেরও উপকার হয়, আমারও কিছু লাভ হয়। ওই যে ছোকরা সুমিত্র সেন প্লেনে একলা বসে আছে—বাবা এত কষ্ট করে, মিউনিসিপ্যালিটিতে চাকরি করে তোকে বরানগর থেকে নিউটনে পাঠালে, আর তুই কিনা অ্যানের সঙ্গে মজে গেলি।

আমার কাছে খবরটা টুলটুল দিয়েছিল। টুলটুল সব খবর রাখতো।

বললে, "সুমিত্রর বাড়ির অবস্থা জানি আমি। অনেকগুলো ভাই। এই ভাই মানুষ হলে আর ভাইগুলো খেতে পাবে। অ্যানের পাল্লায় পড়লে সুমিত্রকে ওই শ্বেত হস্তিনীই পালন করতে হবে, সে বাড়ির কাজে লাগবে না।"

আমি বলেছিলাম, "তুমি জানলে কী করে?"

টুলটুল সোজা বললে, "মেয়েরা অনেক কিছু জানতে পারে। মেয়ে হোস্টেলে, সে কলকাতাই হোক আর নিউটনই হোক, মেয়েরা কী রকম প্রাণ খুলে পরচর্চা করে সে তো জানেন না। আমার পরীক্ষা-পাশের দুশ্চিন্তা না থাকলে একখানা নবেল লিখে ফেলতাম।"

আমি বললাম, "তুমি ঠিক বলছো, অ্যান একেবারে সুমিত্রর জন্যে গদ্‌গদ। অথচ বরানগরে ওদের বাড়িতে যে এখনও খাটা-পায়খানা সে খবর অ্যান রাখে না।"

টুলটুল মেয়েটার ওপর আমার একটু ভরসা আছে, ওর বুদ্ধিসুদ্ধি খুব পাকা। না হলে, সেকেণ্ড ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করে এবং এম-এসসি-তে লো সেকেণ্ড ক্লাশ পেয়েও কেমন করে নিউটনে আসতে পারতো? এই যে নিমাই মুখুজ্যে ওঁকে সুনজর করেছেন, এও টুলটুলের কমন সেন্স। এই কমন সেন্স জিনিসটা যদি ভগবান সত্যিই সহজলভ্য করতেন এবং সব মেয়েদের মধ্যে একটু একটু করে দিয়ে দিতেন তাহলে পৃথিবীর ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতো।

এ কথা কোনো আমেরিকানের কাছে তুলবেন না, তারা স্বীকার করবে না। তাদের উপায় নেই। আমেরিকার যত টাকা তার বেশীর ভাগ মেয়েদের হাতে রয়েছে, ফলে সব পুরুষমানুষের টিকি বাঁধা।

টুলটুলকে বলেছিলাম, "তুমি আমাকে অ্যানের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও। তারপর সুমিত্রকে উদ্ধার করার দায়িত্ব আমার।"

অ্যানকে দেখেই আমার মাথা ঘুরে যাবার অবস্থা। ছোকরা সুমিত্রর কপালে খারাপ জিনিস পড়েনি। আমি যেবার ওকে প্রথম

ডেটে নিয়ে গেলাম, আমার বোধোদয়ের কথা মনে পড়ে গেল, যার তলায় বাবা লাল পেন্সিলে দাগ দিয়ে দিয়েছিলেন, খুব ভাল করে সারাজীবন মনে রাখতে বলেছিলেন—'আমরা চারিদিকে যে সমস্ত বস্তু দেখিতে পাই, ঐ সকল বস্তু কোনও না কোনও লোকের হইবে। যে বস্তু যাহার, সে ব্যক্তি পরিশ্রম করিয়া উহা প্রাপ্ত হইয়াছে।'

সুমিত্র যে-বস্তু পরিশ্রম করে পেয়েছে সেখানে আমাকে ভাগ বসাতে হচ্ছে। আমি যে ভাগ বসাতে পেরেছিলাম তা সোজাসুজিই বলছি। কিন্তু কেমন করে, জিজ্ঞেস করবেন না। ঐ যে বলেছি না, প্রত্যেক মেয়ের একটা সুইচ থাকে, সেটা কোথায় যদি জানতে পারেন, তাহলেই হলো। আমি শুধু নিজে প্রেমের অভিনয় করিনি, সুমিত্র সম্বন্ধে অনেক মিথ্যে কথা অ্যানের কানে ঢুকিয়ে দিয়েছি। কী করবো বলুন, বরানগরের একটা পরিবারকে রক্ষে করলুম, পরিবর্তে পেলাম অ্যানের মতো সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী বালিকা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা।

টুলটুল ব্যাপারটা বুঝেছে। বলেছে, "অনির্বাণদা, আপনার অভিনয় খুব ভাল হচ্ছে। অ্যান এবারে সুমিত্রর ডেট নেয়নি। আপনি পারেন বটে, বলিহারি যাই আপনার ক্ষমতা। অথচ আপনি কাজ করছেন একটা নিরস সাবজেক্টে—'কম্যুনাল রায়ট'। আপনার বিষয় হওয়া উচিত ছিল প্রেমের রায়ট।"

প্রথমে ভেবেছিলুম বেণীমাধবের বাড়িতে পয়সা নেওয়া যাবে না। ডলার নেবার ইচ্ছে আছে, কিন্তু চক্ষুলজ্জা আর কি! হাজার হোক এই ডলারের দেশে আসাটাই ওঁর চেষ্টায়। কিন্তু লক্ষ্য করলুম এই আজব দেশে ডলার ছাড়া কিছুই নড়ে না। ডলার ছাড়া ছেলে বাবার ঘর রঙ করবে না। ছেলে যদি হেয়ার কাটিং সেলুনের মালিক হয় বাপের চুল ছাঁটতেও পয়সা নেবে, এক ঘণ্টার জন্যে বাচ্চা ছেলে ধরলে বোনকেও পয়সা জোগাতে হবে। মায় চার্চেও পয়সার খেলা—খামের মধ্যে কে কত দিচ্ছে তার হিসেব হচ্ছে। কর্তারা ডলারের ওপর বড় বড় করে

লিখে রেখেছেন, ইন গড্ উই ট্রাস্ট—ভগবানে আমরা বিশ্বাস করি। অর্থাৎ সোজা বাংলায়—বিরাট দেশে অঢেল সুযোগ পড়ে রয়েছে, চরে খাও। এবং রোজগারের পর ফেলো কড়ি মাখ তেল, তুমি কি আমার পর?

একটা কায়দা ছেড়েছিলুম। বেণীমাধবকে বলেছিলুম, "আপনার কাছে পয়সা কী করে নেবো? আপনি পাড়ার লোক, বাবা আপনাকে ভালবাসতেন।"

বেজায় খুশী হয়ে বেণীমাধব সঙ্গে সঙ্গে আইলীনকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। "আইলীন, শোনো এর কথা। পয়সা নিতে চাইছে না। এই হচ্ছে ভারতবর্ষের ঐতিহ্য। পয়সা সেখানে নোংরা জিনিস। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, টাকা মাটি, মাটি টাকা।"

আইলীনও গর্ব বোধ করেছিলেন। আমি তো ইতিমধ্যে নার্ভাস। শেষ পর্যন্ত ওঁরা না রাজী হয়ে যান।

আইলীনের পরের কথা শুনে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। "তোমার প্রস্তাব আমরা খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করলাম। কিন্তু এটা বিদেশ। এখানে এক ঘণ্টা রেস্তোরাঁয় কাজ করলে বা বেবি সীটার হলে টাকা পাবে তুমি। সুতরাং তোমাকে নিতেই হবে।"

সোজাসুজি নেবার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন আইলীন। সব সময় একটা খামে করে সপ্তাহের ডলার দিয়ে দিতেন। আর সেই ডলারের খাম আমি উইক এণ্ডে খালি করে ফেলতাম। সেই যে মেয়েটা ক্রিশ্চিন, ওর সঙ্গে কী রকম রাসলীলা করছি তার রিপোর্ট কার্ল ও আমার প্রতিবেশিনী ওলগাকে দিয়ে যাচ্ছি।

ওলগা মিটমিট করে হাসে। বলে, "অল দি বেস্ট।"

আর কার্ল অভিজ্ঞ ডাক্তারের মতো বলে, "তুমি একটি আস্ত গর্দভ! ফোকসওয়াগেনে চেপে ডেটিং-এর প্রথম অঙ্ক চলে। তৃতীয় অঙ্কে এসে এখনও তুমি বেবি গাড়ি চালাচ্ছ।"

আমি যে অনেক ব্যাপারে এখনও সত্যিই গর্দভ আছি তা বুঝলাম।

কার্ল বললে, "ফি দিয়ে আমার কাছে টেকনিক্যাল নো-হাউ নাও! এদেশের গাড়িগুলো এতো বড় কেন বল তো? আমার ডক্টরেটের বিষয় হবে—দি রোল অফ সেক্স ইন অটোমবাইল ডিজাইনিং। যে গাড়ির পিছনে শোয়া যায় না, মার্কিন যুবক-যুবতীদের কাছে তার কোনো দাম নেই।

বললুম, "ফুলশয্যার গাড়ি কিনতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে। এখনই টাকা পাচ্ছি কোথায়?"

কার্ল বললে, "টাকা রোজগার করে তবে ভোগ করার রীতিটা উনিশ শতকের। একেবারে পচে গিয়েছে। এখন আগে ভোগ করো, পরে টাকা দাও। আর যদি তাও না সাহস করো, গাড়ি ভাড়া নাও। কাগজে, টেলিভিশনে, বড় বড় গাড়িভাড়া কোম্পানি এতো বিজ্ঞাপন দিচ্ছে কেন? নিউটনে গাড়ি ভাড়া নিয়ে নিউটনেও ফেরত দিতে পার, না হলে যেখানে খুশী জমা দেওয়া যায়।"

সুতরাং পরের বার নতুন গাড়ি ভাড়া নিয়েই বেরিয়েছিলাম ক্রিশ্চিনকে আনতে। ক্রিশ্চিন সব আন্দাজ করেও বোকা সাজলে। মেয়েদের এই ন্যাকামিটুকু সহ্য করতেই হয় সব বেটাছেলেকে।

কেন আজকে এই ঢাউস গাড়ি এনেছি বুঝে ও বললে, "এই গাড়িটা কবে কিনলে?"

বললুম, "কিনিনি, তোমার জন্যে ভাড়া করলুম।"

"কেন?" ক্রিশ্চিনের প্রশ্ন।

মনের হাসি চেপে রেখে বললাম, "সুন্দরী, তোমার পা দুটো কত লম্বা! ছোটগাড়িতে যে তোমার কষ্ট হয়।"

তারপর আমরা চলে গিয়েছিলাম বনের ধারে সেই ছোট্ট রেস্তোরাঁয়। সেখানে ডিনার ডান্স সেরে বেরিয়ে পড়েছিলাম অজানার উদ্দেশে। প্রায় জোর করেই ক্রিশ্চিনকে আজ কয়েক পেগ হুইস্কি খাইয়েছি।

হুইস্কির মাদকতা ওর সমস্ত শরীরে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে—ওর দেহটা টলমল করছে। আর একটা আদিম যুগের পশু আমার মনের গহন অরণ্য থেকে বেরিয়ে এসে ওর দিকে ক্ষুধার্ত দৃষ্টিপাত করছে। ক্রিশ্চিন সব বুঝতে পেরেও অনুশোচনা করছে না। চোখ দুটো আধ-খোলা রেখে আমাকে মৃদু ভৎর্সনা করলে, "ইউ নটি ইণ্ডিয়ান!"

"আবার ইণ্ডিয়ান ফিণ্ডিয়ান কেন? দুষ্টু পুরুষ-মানুষ বলো, ক্রিশ্চিন।"

"কেন, তুমি ইণ্ডিয়ান থাকতে চাও না?"

ষ্টিয়ারিঙে হাত রেখে আমি এই অবস্থায় একটু কাব্যও করছি, "ক্রিশ্চিন, তুমি তো দর্শন পড়ো। আমার মধ্যে এখন নিখিল মানব-অনুভূতি কাজ করছে।"

সিগারেটে টান দিয়ে সে বললে, "এই জন্যেই তোমাকে পছন্দ করি। জান্তব মুহূর্তেও তুমি পুরোপুরি অ্যানিম্যালের মতো ব্যবহার করো না। তোমার মধ্যে একটা পোয়েট কাজ করছে।"

ক্রিশ্চিনের চুম্বনধন্যবাদ নতমস্তকে গ্রহণ করেছিলাম। এই মুহূর্ত-গুলো আমার খুব ভাল লাগে। আমি খুব এনজয় করি, পৌনঃপুনিকতা প্রত্যাশা করি!

ভাড়া করা গাড়িটাকে এরপর বনের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলেছিলাম। অরণ্য, কিন্তু নির্জন নয়। কাছাকাছি আরও দু-দশটা গাড়ি ছিল, যদিও ড্রাইভারের সীটে কাউকে দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু আমরা নিজেদের ছাড়া অন্যের প্রাইভেসী ডিসটার্ব করিনি!

বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে, আমার অফিস রুমে বসে চিন্তা করেছি, ক্রিশ্চিন যে আমাকে চরম প্রশ্রয় দিয়েছে, সে বিয়ের আশায়। ভাবছে আমার মনটা বেঁধে ফেলেছে। সেই রকম আরও আধ ডজন মেয়ে ভাবছে। আমি তাদের উপভোগ করেছি, কিন্তু তা বলে জড়িয়ে পড়ছি না। হৃদয়

বদল করলেই আংটি বদল করতে হবে এটা অন্যায় আব্দার।

গুরুমশাই, পণ্ডিতমশাই, সমাজপ্রধান সবাই যুগযুগান্ত ধরে বলছেন, নিজের ইচ্ছাকে সংযত করো। কিন্তু কেমন করে এই শালা ইচ্ছাকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা যায় তা কেউ বলছে না। বুঝি তো মেয়েমানুষে, অর্থে, উপভোগে লোভ না করলেই শান্তি—কিন্তু কোনো ব্যাটা ইন্দ্রিয় আমার কথা শোনে না। আর বলিহারি যাই আমাদের মরাল গার্জেনদের, কোনো নো-হাউ দেবে না, শুধু লেকচার শোনাবে—নিজেকে সংযত করো, নিজের মনের আগুনে নিজেকে শুদ্ধ করো।

আরে বাপু, জিনিসটা অত সোজা নয়। আর শুধু কি নারীমাংস-ক্ষুধা? বহু রকমের ইচ্ছা মনের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে রয়েছে।

আমার অনেক কিছু ইচ্ছে করে। আমি চাই—আমার নামের পাশে অনেকগুলো দেশ-বিদেশের ডিগ্রি লেখা হোক। আমার ইচ্ছে করে বেণীমাধব রায়ের মতো আমিও হার্ভার্ড কিংবা ক্যালিফোর্নিয়ার প্রফেসর হয়ে বসি। আমি মানসচক্ষে দেখতে ভালবাসি এক থাক মোটা মোটা বই—যার প্রতিটাতে লেখকের নাম ছাপা রয়েছে ডঃ অনির্বাণ চ্যাটার্জি। আমি চাই আমার সে-সব বই অজস্র বিক্রি হবে, দুনিয়ার কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি একটা দিন থাকলে তারা ধন্য হয়ে যাবে। আমি চাই ইউ-এন-ও আমার কাছে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ নিক। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল স্বয়ং চিঠি লিখুন—ওঁকে ছ' মাসের জন্যে ছুটি দিন, এশিয়াতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিবৃত্তির জন্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘকে উপদেশ দেবার জন্যে ডঃ চ্যাটার্জিকে আমাদের প্রয়োজন। আমি চাই ভারতবর্ষে আমার নাম করলেই লোকের মাথা শ্রদ্ধায় নত হোক। কিন্তু আমি তাদের জন্যে কিছু করতে পারবো না। আমি কারুর জন্যেই—সে এই বিশ্ববিদ্যালয় হোক, আর জাতিসঙ্ঘ হোক—কিছুই করতে পারবো না।

এই যে আমার ফেলোশিপের কাজ—ধর্ম, ভাষা, শ্রেণী এবং বর্ণ

অনুযায়ী দাঙ্গা—তার কোনো কাজই এগোচ্ছে না। আমার কর্তা ডঃ স্মিথের খুব আগ্রহ। বেনহিল ফাউণ্ডেশন যে এত টাকা ঢালছে তার কারণ তাদের বিশ্বাস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা সম্পর্কে কাজ হওয়া উচিত। যেন অনির্বাণ চ্যাটার্জির বিস্তারিত রিপোর্ট বেরোলেই দুনিয়ার সব রায়ট বন্ধ হয়ে যাবে। যারা রায়ট করবে, যারা অন্যের বুকে ছুরি বসাবে, গুলি ছুড়বে, দোকানে আগুন ধরাবে, অসহায় নারী ও শিশুর ওপর অত্যাচার করবে তারা যেন অনির্বাণ চ্যাটার্জির লেখা পড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে। আমার অ্যাপ্লিকেশনে অবশ্য আমি এমন সব কথা লিখে-ছিলাম যে, এই কাজে মানবজাতির মহা উপকার হবে, শুধু অর্থাভাবে কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

হয়তো একটু বাড়াবাড়ি হয়েছিল। কিন্তু না হলে পেট্রোল ম্যাগনেট বেনহিলের টাকা পাওয়া যেতো না। আমিও তো বাপু বেনহিল সায়েবের হিস্ট্রি পড়েছি। কী করে এই কোটি কোটি ডলার কামিয়েছে তাও জানি। আর তোমার ছেলেকে জাপানীরা যুদ্ধের সময় চাবকে না মেরে ফেললে কিছুই খয়রাতি করতে না তুমি। যেহেতু অনেক ডলার রয়েছে তোমার ফাউনডেশনে, সেহেতু দুনিয়ার সমস্ত মঙ্গলের ভার তোমার কাঁধেই পড়েছে। সব ব্যাটাই দুনিয়ার মঙ্গল চাইছে। কেন বাপু, দু' একটা ছেলেছোকরা, যারা জীবনটাকে একটু চেখে দেখতে চায়, একটু সুখ ভোগ করতে চায়, তাদের জন্যে কিছু ডলারের ব্যবস্থা রাখলে কী মহাভারত অশুদ্ধ হতো? হয়তো বলবে, কে আর সুখ চায় না? তা তখন পরীক্ষা করে দেখলেই পারো কার ভোগের আকাঙ্ক্ষা সবচেয়ে তীব্র। তাকেই ফেলোশিপটা দেওয়া চলতো।

আমার একটা বাঁচোয়া, পরীক্ষা দিতে হবে না। বেণীমাধব লিখেই দিয়েছিলেন, "কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রতিভাবান এম-এ নিছক ডক্টরেটের প্রত্যাশী নয়—সে ভাল কাজ করতে চায়।" পরীক্ষা অতি

কুৎসিত জিনিস—কোনো সভ্য সমাজে পরীক্ষা থাকা উচিত নয় বলে আমি বিশ্বাস করি।

এইসব ভাবনা চিন্তার মধ্যে জিয়া হাজির হয়েছে ঘরে। "কী দাদা, গভীর চিন্তা করছেন?"

স্রেফ মিথ্যা বললাম, "একটা শক্ত চ্যাপ্টার পরিকল্পনা করছি।"

জিয়া বাঙালী বাঙালী করেই পাগল। "বাঙলার রায়ট সম্বন্ধে খুব ভাল করে লিখছেন তো দাদা? পৃথিবীর মধ্যে এই একমাত্র জাত যারা হাড়ে হাড়ে বুঝেছে দাঙ্গা করে তারা নিজেদের কী সর্বনাশ করেছে।"

জিয়াকে উস্কানি দিলুম, "বাঙালীরা সব জিনিসই একটু দেরিতে বোঝে। এমন সময় চৈতন্য হয় যখন কিছু করার থাকে না। এই যে ইন্দ্রাণী দেবীর প্রাণের ইচ্ছে, তা আমি না বললে তুমি এমন সময়ে বুঝতে যখন কিছু করার থাকতো না।"

কান লাল হয়ে উঠলো ছোকরার। "এখন সিরিয়াস কথা হচ্ছে দাদা। বাঙলা আমার কাছে সবার বড়। বাঙলা আমার মা, বাঙলা ভাষা আমার মায়ের ভাষা। দেখবেন বাঙলা একদিন আবার কত বড় হয়—তুনিয়ার মানুষ আবার একদিন বাঙলার বন্দনা করবে। আপনাকে, আমাকে এবং প্রত্যেক বাঙালীকে এর জন্যে চেষ্টা করতে হবে।"

বললাম, "যুবক, তুমি ঢাকায় ফিরে গিয়ে বাঙালী উন্নয়নের চেষ্টা কোরো। ইণ্ডিয়ার বাঙালীদের এর মধ্যে টেনো না। আমরা কলকাতার লোকরা মরে গিয়েছি। শুধু ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু হয়নি বলে দাহ করা যাচ্ছে না।"

জিয়া আমার কথায় রাগ করে না। বললে, "মরা হাতিই লাখ টাকা—ক্যালকাটা ইজ ক্যালকাটা। তবে আপনাকে বলে রাখছি, বাঙালীদের অন্যায়ভাবে চেপে রাখার চেষ্টা হলে আবার আগুন জ্বলবে। সে-আগুন বিপ্লবের আগুন। আপনার দাঙ্গার বইতে হবে না, আপনাকে আরও কিছু লিখতে হবে।"

জিয়াকে বললাম, "শ্রীমান জিয়া, যতদূর জানি তোমরা ছোটবেলায় কলকাতায় থাকতে। কলকাতার রায়টে অনেক কিছু খুইয়ে ঢাকায় পালালে।"

"ঠিকই শুনেছেন দাদা। কিন্তু ওমা, ঢাকায় এসে দেখলাম নিরীহ গরীব হিন্দুর ওপর হামলা হচ্ছে। নোয়াখালিতে কি নরককাণ্ড হয়েছিল সে তো জানেনই। আবার বিহারে তার বদলা নেওয়া হয়েছে। ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে? দুর্বলের ওপর অত্যাচার হচ্ছে। এতোই যদি বীর তোরা, তাহলে ইংরেজকে মেরে তাড়ালি না কেন? তোরা জাগবি এই আশায় তো কত লোক লাটসায়েবকে গুলি করলে, অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করলে, বোমা ফেললে। কিন্তু কারুর ঘুম ভাঙলো না। তারা ফাঁসিতে গেল। কোটি কোটি লোক ভেড়ার মতো এই সরকারী নরহত্যা সহ্য করলো, বড় জোর খবরের কাগজের এডিটোরিয়াল পড়ে চোখের জল মুছলে। কিন্তু ওই পর্যন্ত! তারপরই বৌ-এর সঙ্গে ঘুমোবার জন্য ঘরের খিল বন্ধ করে দিল।"

জিয়া বললে, "দাদা, আপনি এমন রিপোর্ট লিখুন যেন বাঙালী জাতটা আবার জেগে ওঠে। আমি আপনাকে পদ্মার ইলিশ খাওয়াব।"

জিয়া আরও বললে, "লিণ্ডা বলে মেয়েটাকে মনে পড়ে আপনার? দু' একবার ডেট-টেট করেছি। সেদিন বেঙ্গলী তুলে গালাগালি করতে যাচ্ছিল। আরও দু' একটা বাঙালীর সঙ্গে নাকি ডেট করেছে। বললে, এরা ভাবে আমেরিকান মেয়েরা সস্তা, ডেটিং-এর পরেই এরা বোধহয় শুতে যাবে। আমি বললাম, তুমি বেঙ্গলী কথাটা তুলে নিয়ে ক্ষমা চাও। ছুঁড়ী রাজী নয়। আমি সোজা বললাম, তাহলে এখানেই ডেট-এর শেষ। আমি চললাম। ছুঁড়ী এখন বাঙালী মুসলমান জিয়াবুরকে শিক্ষা দেবার জন্যে ইণ্ডিয়ান শিখ মিঃ কাপুরের সঙ্গে ঘুরছে। বলছে, শিখধর্ম গ্রহণ করবে।"



সেই যে আকাশে উঠেছি তারপর যে কয়েক ঘণ্টা কেটে গিয়েছে আমরা যে উড়েই চলেছি তা খেয়াল ছিল না। হঠাৎ এয়ার হোস্টেসের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, আমাদের নিরাপত্তা বেল্ট বাঁধবার অনুরোধ করা হচ্ছে, আমরা কয়েক মিনিটের মধ্যেই টোকিও বিমান বন্দরে পৌছবো।

আমি বেল্ট বেঁধে নিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছি। মহাসমুদ্রের বুক থেকে ক্রমশ একটা তীরভূমি স্পষ্ট হয়ে উঠছে। প্লেনটা যতই নিচে নামছে ততই কয়েকটা করে বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে। প্লেনের মধ্যে উঁকি মেরে ফাস্টক্লাশ দেখতে পাচ্ছি। এই একটা সুযোগ যখন প্রথম শ্রেণীর দেবদেবীদের দেখতে পাওয়া যায়—কারণ প্লেন নামবার সময় পর্দা সরিয়ে ফেলতে হয়।

একটা বিরাট চিলের মতো দু'বার এয়ারপোর্টের ওপর পাক খেয়ে তীরবেগে প্লেনখানা রানওয়ের কাছে এগিয়ে এল এবং মাটি-স্পর্শের সময় সামান্য ধাক্কা দিয়ে জানিয়ে দিলে মাটি ও প্লেনটার মধ্যে আটখানা হাওয়া-ভরা রবারের চাকা রয়েছে।

এখানে কিছু যাত্রীর ওঠা-নামা আছে। আমরা ট্রানজিট লাউঞ্জে আধ ঘণ্টা বসে এয়ার কোম্পানীর পয়সায় কফি ধ্বংসাবো। ইচ্ছে করলে আমরা ডিউটি-ফ্রি শপে জাপানী মাল কিনতে পারি। সুমিত্র ওদিকেই ছুটলো। জাপানী মুক্তোর মালা কিনতে।

টুলটুলের সঙ্গে দেখা হলো। বললাম, "কোথায় যাচ্ছো?"

বললে, "সুমিত ধরেছে ভাবী বউ-এর জন্যে মুক্তোর মালা পছন্দ

করে দিতে। জানেন, অনির্বাণদা, শ্রীমান সব সময় ভাবী বউ-এর ছবি মানি-ব্যাগে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ-মাসের পনেরো তারিখেই বিয়ে। এখনও নিজের চোখে দেখেনি। ওর বাবা সব ঠিক করে রেখেছেন।"

আমি কাঠখোট্টা মানুষ। ভাবলুম একবার অ্যানের কথাটা মনে করিয়ে দিই শ্রীমান সুমিতকে। ছোকরা আমাকে তেমন পছন্দ করে না, একটু এড়িয়ে যায়। কিন্তু বাপু আমাকে ঘাঁটিও না। এখনও তোমার পকেটের ওই কচি কচি মেয়েটিকে—যে তোমার রাঙা টুকটুকে বৌ হতে চলেছে—তাকে বেহাত করে দিতে পারি। স্রেফ একটা টেলিফোনের ব্যাপার। তোমার সম্বন্ধে অ্যানের মতামত আমার ব্যাগেই আছে। বাঙলা দেশে সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে আজকাল সস্তা নয়—মেয়ের বাবারাও সেটা বুঝে গিয়েছে!

টুলটুলকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, "তা তোমার খবর কী?"

টুলটুল মেয়েটি বেশ। কেমন ঝটপট ডক্টরেট করে ফেললে। বলতে যাচ্ছিলাম, "তোমার যে একটি প্রাণেশ্বর বউবাজারে আছেন সে খবর ইন্দ্রাণী আমাকে দিয়েছে। সে নিশ্চয় দমদমে আসবে তোমাকে রিসিভ করতে।"

কিন্তু জিজ্ঞেস করার আগেই নিমাই মুখুজ্যে এসে হাজির হলেন। নিমাই মুখুজ্যে টুলটুলকে নিজের সম্পত্তি মনে করেন। টুলটুলও তেমনি চালাক। পিছলে পালাল। টুলটুল বললে, "নিমাইদা, আপনি অনির্বাণবাবুর সঙ্গে কথা বলুন। আমি সুমিতকে মুক্তোর মালা পছন্দ করে দিয়ে আসি।"

নিমাই মুখুজ্যের মন খারাপ হয়ে গেল। বললেন, "তুমি নিজের জন্যে কিছু কিনবে না?"

"রক্ষে করুন। আমেরিকায় থেকে থেকে হাড়কিপটে হয়ে গিয়েছি। মালা কিনে ডলার খরচ করবো!"

নিমাই মুখুজ্যে ছটফট করতে লাগলেন। আমি সামনে না থাকলে

নিশ্চয় বলতেন, "টুলটুল, আমার খুব ইচ্ছে তোমাকে একটা মুক্তোর মালা উপহার দিই।"

নিমাই মুখুজ্যের ব্যাঙ্কে এত ডলার আছে যে, তাতে কিছুই এসে যেতো না। কিন্তু নিমাই মুখুজ্যে আমাকে একটু ভয় করে চলেন। আমাকে তিনি বেপরোয়া, বখাটে, গুণ্ডা ধরনের ছোকরা বলে জানেন।

নিমাই মুখুজ্যে একটা টাইপ করা চিঠি পেয়েছিলেন, সে চিঠিতে কারও সই ছিল না। তাতে লেখা ছিল, "হে অধ্যাপক, তুমি বার্ধক্যের দ্বারে এসে কেন একজন কন্যাসমা কিশোরীর প্রতি আকৃষ্ট হলে? তুমি তাকে নিজের খরচে এদেশে আনিয়েছ, তাকে ডক্টরেট পেতে সাহায্য করছো, সব সত্যি। কিন্তু মেয়েরা তার জন্যে বুড়োর গলায় মালা দিতে রাজী হয় না। টুলটুলের প্রেমের মালা পেতে হলে যেসব গুণ থাকা চাই তা তোমার নেই। টুলটুলের লোভ ত্যাগ করে তুমি স্বদেশে যাও এবং কোনো মধ্যবয়সিনীর পাণিগ্রহণ করে ফিরে এসো।"

ইন্দ্রাণীই বলেছিল, "জানেন, তুলকালাম ব্যাপার। নিমাই মুখুজ্যোকে উড়োচিঠি দিয়েছে কে। নিমাই মুখার্জি বলছেন, এত ডার্টি ডাষ্টবিনের মতো নোংরা মন কার?"

তা আমার দোষের মধ্যে শুধু মন্তব্য করেছিলুম, "ডাষ্টবিন তো রয়েছে নিমাই মুখুজ্যের মনে।" সেই খবরটাই ঘুরেফিরে ওঁর কানে হাজির হয়েছিল। ওঁর ধারণা হয়ে গেল আমিই চিঠিটা লিখেছি। কিন্তু নিমাই মুখুজ্যে বুঝলেন না, আমি উড়ো চিঠি লেখার মাল নই। দরকার হলে আমি সোজা ফোন তুলেই এসব কথা বলে ফেলতাম।

আমার যেটা ভাল লাগে না সেটা হলো নিমাই মুখুজ্যের এই সাধু-সাধু ভাব। যেন বাঙলা দেশের ছেলেমেয়েদের মঙ্গলের জন্যে তাঁর কত চিন্তা, বাঙলার সংস্কৃতিকে প্রচারের জন্যে তাঁর কত আগ্রহ! সেই জন্যই তো গতবারে যখন দেশে ফিরে টুলটুলকে দেখলেন, এম-এস্সি পাশ করে মেয়েটা আর পড়বার সুযোগ পাচ্ছে না, তখন তিনি নিজেই

নিউটনে সব ব্যবস্থা করে দিলেন। আরে বাপু, টুলটুল যদি দেখতে খারাপ হতো, যদি সে তোমার মনে না ধরতো, দেখতাম তুমি কেমন ওর উপকার করতে। তোমার মুস্কিল হয়েছে মেমসাহেব দেখে দেখে তোমার রুচি পাল্টে গিয়েছে। তুমি গাছেরও খাবে, তলারও কুড়োবে। তুমি মেমসাহেবের মতো দেখতে বাঙালী মেয়ে চাও, অথচ বয়সেও খুকী হতে হবে। টুলটুলকে কব্জা করতে পারলে এই বুড়োবয়সে তোমার সুখের শেষ থাকতো না—যেমন শিক্ষা, তেমন স্বাস্থ্য, তেমন রূপ, তেমন সখীভাব আর তেমনি কচি বয়স। কিন্তু বাপু তুমি ভুলে যাচ্ছ, বাংলা দেশেও দোজবরেদের দাপট কমে যাচ্ছে, টাকা ফেললেই অল্পবয়সী নারীরত্ন পাওয়া যায় না।

টুলটুলকে তুমি গার্জেন হিসেবে ছেলেছোকরাদের সঙ্গে বেশী মিশতে দাওনি, তার ঘোরাঘুরির ওপর নজর রেখেছো। খোদ আমেরিকায় বসে তুমি শ্যামবাজারের বনেদীয়ানা ফলাতে চেয়েছ। তাতেও তো আমাদের আপত্তি ছিল না। কিন্তু যে রক্ষক সেই ভক্ষক হবে এইটাই ভাল লাগে না। আসলে টুলটুল তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ, কিন্তু সে যে তোমায় পছন্দ করে না সেইটুকু তুমি বুঝলে না। তবুও তুমি আশা ছাড়নি। একই প্লেনে দেশে ফিরে যাচ্ছ, যেহেতু তোমার সোজাসুজি কথা পাড়বার সাহস নেই, ভাবছ কলকাতায় গিয়ে কাউকে ঘটকালি করতে বলবে।

কিন্তু সে-গুড়ে বালি—টুলটুল এখানে আসবার আগেই এক ছোকরার সঙ্গে পাকা কথা বলে এসেছে। সেই ছোকরা ডাক্তার এখন ইডেন হাসপাতালে লেবার ডিউটি দিচ্ছে। তার টাকা নেই, তোমার থেকে তার মাইনে অনেক কম, কিন্তু তার বয়স আছে। নিমাই মুখুজ্যে, কেমন করে তোমায় বোঝাবো, টাকা দিয়ে বয়স কেনা যায় না।

অথচ তুমি উড়ো চিঠিটা পেয়ে রেগে গিয়ে আমাকে সন্দেহ করলে। আমাকে বন্ধুর মতো জিজ্ঞেস করলে সোজা বলতাম, "দাদা, আমি লিখিনি।" কিন্তু তোমার সে-সাহস নেই। তুমি ভিতরে ভিতরে

জলাতে লাগলে। আমি বুঝছি, এই যে আমাকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে ফিরতে হচ্ছে তার পিছনেও তোমার হাত আছে।

আমি তো একেবারে নিশ্চিত ছিলুম, আমি আরও এক বছর এক্সটেনশন পাবো। মায় একটা পড়ানোর কাজ জুটে যেতে পারে—কারণ পৃথিবীতে দাঙ্গা সম্পর্কে যে ক'জন মনীষী গভীরভাবে অনুসন্ধান করেছেন আমি তাঁদের একজন হতে চলেছি। আমি যদি একটু গতর নাড়িয়ে লেখাটা শেষ করতে পারতাম, তাহলে ম্যাগসেসে পুরস্কার-এর জন্যে চেষ্টা করতাম। দেখুন, আমি কত বিবেচক। অন্য কেউ হলে হয়তো নোবেল পুরস্কারের লোভ করতো। এই সব ভাবছি, নিজের কাজটা ছাড়া আমি আর সবই ঠিক করে যাচ্ছি, এমন সময় বোমা ফাটলো। আমার কর্তা ওই কাজ-পাগলা ডক্টর স্মিথ আমাকে ডেকে পাঠালেন।

ডক্টর স্মিথ বললেন, "চ্যাটার্জী, তুমি বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ লোক। তোমাকে না-দেখেই, কার কথায় বিশ্বাস করে আমরা তোমাকে নিয়েছিলাম তা নিশ্চয় তোমার মনে আছে। আমরা তোমার টার্ম আরও একবছরের জন্যে বাড়াবার কথা ভাবছিলাম। কিন্তু সেই সময় একটা খবর পেয়ে আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। তোমার অ্যাপ্লিকেশনে লেখা আছে তুমি এম-এ পাশ; সার্টিফিকেটের কপি দিয়েছিলে তুমি। কিন্তু কেউ জানিয়েছেন খবরটা ঠিক নয়। গেজেট খুঁজেও ওই বছরের এম-এ পাশের তালিকায় তোমার নাম পাওয়া যাচ্ছে না। জাল সার্টিফিকেট পাঠিয়েছিলে তুমি, এই খবরও রয়েছে। এক্ষেত্রে সাধারণত কোর্টঘর হয়। তোমাকে পুলিসে দেওয়া যায়। কিন্তু তাতে ডঃ রায় বিব্রত বোধ করবেন। ডঃ রায়ের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি প্রথমে বিশ্বাসই করতে চান না। অনেকক্ষণ গুম হয়ে থেকে বললেন, 'হারাণবাবুর ছেলের পক্ষে কেমন করে এ-কাজ সম্ভব?' বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'একজন তোমাকে পুলিসে পাঠাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ডঃ রায় বললেন,

'আমার ব্যক্তিগত লজ্জা ছাড়াও ভারতের ক্ষতি হবে। ইণ্ডিয়ার আগামীযুগের ছাত্রছাত্রীদের খুব অসুবিধা হবে।' তাদের মুখ চেয়ে ডঃ রায় আমাকে অনুরোধ করলেন, তোমাকে নীরবে ছেড়ে দিতে। তোমার টার্ম তো শেষ হয়ে আসছিল।"

আমি চোখ রাঙাতে পারতাম কিন্তু এম-এ পরীক্ষায় যে শেষ পর্যন্ত পাশ করতে পারিনি এটা মিথ্যা নয়। নানা ঝামেলায় মনটা তখন উড়ে বেড়াচ্ছিল, দু'একটা প্রেম-টেম-এর সমস্যাও ছিল, পড়াশোনা হয়নি—যদিও আমার বিদ্যে অনেক এম-এ পাশ থেকে বেশী। আমি আর কিছুই বলিনি। বেশী বাড়াবাড়ি করলে হয়তো এখনই পুলিস ডাকবে এবং জেলে ঠেলবে। আর যা আমেরিকার কাগজগুলো, ছবিটবি ছাপিয়ে ওয়ার্লড নিউজ করে ছাড়বে। পাসপোর্ট খুলে দেখলাম আমার ভিসার মেয়াদও শেষ। ইউনিভার্সিটির লিখিত অনুরোধ না পেলে ওরা আর থাকতে দেবেন।

স্মিথ বলেছিলেন, "চ্যাটার্জি, তুমি খুব ভাগ্যবান। ব্যাপারটা আমি এবং ডঃ রায় ছাড়া আর কেউ জানে না। রায় আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন, আমি যেন অভিযোগটা অফিসিয়ালি টেকআপ না করি।"

তাহলে বুঝতেই পারছেন, কেন আমি টিকিট কিনে দেশে ফিরে যাচ্ছি। সবাই জানে আমার ফেলোশিপের মেয়াদ শেষ হয়েছে। একজন ছাড়া—যে স্মিথকে উড়ো-চিঠি লিখেছিল। আমি নিমাই মুখুজ্যের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি।

নিমাই মুখুজ্যে কেমন বোকা সেজে বসে আছে। এই মুহূর্তে আমি ওর সর্বনাশ করতে পারি। আমি ওকে বলে দিতে পারি টুলটুল সম্পর্কে উড়ো-চিঠিটা কে লিখেছিল তাকে। কিন্তু আমি এখন বলবো না। দমদমের মাটিতে নেমে, কাস্টমস-এর বেড়া পেরিয়ে বাইরে এসেই বলবো, চিঠিটা লিখেছিল স্বয়ং আপনার নয়নের মণি টুলটুল। আপনি

টুলটুলকে বড় জ্বালাতন করছিলেন। আপনি জানতেন, টুলটুল হচ্ছে দিলীপ সেন নামক ডাক্তারের সম্পত্তি। ছোটবেলায় বোধোদয় পড়েননি? 'যে বস্তু যাহার, তাহা তাহারই থাকা উচিত।'

এইখানে এই টোকিও এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে নিমাই মুখুজ্যের নাকে একখানা ঘুষি মারলে কেমন হয়? নাকটা একেবারে জাপানী হয়ে যাবে। কিন্তু টুলটুল আর সুমিত্র ফিরে এল। ওদের মালা কেনা হয়ে গিয়েছে। রানীগঞ্জের একটা অজানা মেয়েকে ঘুষ দেবার জন্যে শতখানেক নিরীহ সামুদ্রিক ঝিনুককে বেঘোরো প্রাণ হারাতে হয়েছে।

এদিকে আবার প্লেনে ফিরবার ডাক এসেছে। এখনই আমাদের উঠতে হবে।

এরোপ্লেনে বসেছি। কুমারের সঙ্গে কথাবার্তা হলো না। ও ট্রানজিট লাউঞ্জে কোন এক জাপানী স্কলারের সঙ্গে আলাপ করছিল। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অধ্যাপকের সঙ্গে চিঠিতে জানাশোনা ছিল। খবর পেয়ে তিনি দেখা করতে এসেছিলেন।

এরোপ্লেনে আবার কোমরে দড়ি দিলাম। জাহাজের ক্যাপ্টেন পাল্টেছে। বিমান-সেবিকাগুলোও এবার অন্য—আগের দলের থেকে অনেক ফুটফুটে। মাঝে মাঝে হোস্টেস না পাল্টালে দূরপাল্লার বিমানে বড় একঘেয়ে লাগে। মেজাজটা তেমন ভাল নয়, না হলে সুন্দরীদের সঙ্গে একটু রস-রসিকতা করা যেত। কার্ল ছোকরা তো হোস্টেসদের সঙ্গে ডেট করবেই। ওর আশ্চর্য ক্ষমতা। দু' চারটে মামুলি কথা-বার্তার পরই নিজের কাজের কথা সেরে নেয়। এও একটা আর্ট, বুঝলেন। ঠিকমতো প্রস্তাব করতে না পারলে, মারধোর খাবার সম্ভাবনা থাকে।

রানওয়েতে দৌড় শেষ করে প্লেন আবার আকাশে উঠে পড়েছে। আর দুটো মাত্র স্টপেজ—হংকং আর ব্যাংকক।

কুমার দেখছি আমার ব্যাপারটা জানে না। বললেন, "মাস্টার-

মশায়, আপনি আরও কিছুদিন স্টেটসে থাকবার কথা ভাবছিলেন না ?"

বললুম, "শরীরটা ঠিক যাচ্ছে না। তাছাড়া মায়ের খুব ইচ্ছে আমি ফিরে আসি। মা আর ক'দিন ?"

"মাস্টারমশায়, বাবা বলেন, মাকে কখনও দুঃখ দিও না। আমার ঠাকুমার তখন খুব অসুখ। বাবার কাছে একটাও টাকা নেই। বাবা টাকা ধার করবার জন্যে দু'খানা বাসন নিয়ে বেরিয়েছিলেন। ঠাকুমা বলেছিলেন, যাস না। কিন্তু বাবা শোনেননি। দেড় ঘণ্টা পরে বাবা যখন ফিরে এলেন তখন ঠাকুমা নেই। বাবা বলছিলেন, আপনার বাবা ঠাকুমার দাহের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।"

এসব কথা কুমার ও আমি অনেক আলোচনা করেছি। কুমার বলতো, "জানেন মাস্টারমশায়, বাবার কাছে শুনি, ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ লোক বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। অথচ মানুষ সেখানে কুঁড়ে নয়, পরিশ্রম করতে প্রস্তুত। কিন্তু তারা পথ খুঁজে পাচ্ছে না।"

আমি এসব ব্যাপারে কখনও মাথা ঘামাইনি। তাই শুধু হুঁ হাঁ করে গিয়েছি। কুমার বলেছিল, "মিস্টার চাটার্জি, বাবা আপনাকে মাস্টারমশায় বলে ডাকতে বলেছেন। ইংরেজী ও সংস্কৃত মিশে এই মিষ্টি কথাটা তৈরি হয়েছে।"

তারপর আমাদের নানা বিষয়ে আলোচনা হতো। কুমার ওর বাঙলা সড়গড় করতো। আমাদের সমাজ, আচার ব্যবহার সম্বন্ধে খোঁজখবর করতো।

কুমার বলতো, "জানেন মাস্টারমশায়, ঠাকুমা মারা যাবার পর বাবা বাড়িতে তাঁর অংশ বিক্রি করে দিলেন। সেই টাকা নিয়ে বিলেতে চলে এলেন—সেখানে কাজকর্ম করে কিছু টাকা জোগাড় করে আবার পড়াশোনায় ঢুকলেন। তারপর চলে এলেন ইউ-এস-এর নিউটনে। বাবাকে কতবার বলি, চলো আমরা তোমার রাজবল্লভ সাহা লেন দেখে আসি। বাবা গম্ভীর হয়ে যান, কোনো কথা বলেন না।"

মিসেস রায় আমাকে খুব আদর-যত্ন করতেন। বলতেন, "কুমারকে তুমি ভাল করে শিখিয়ে পড়িয়ে নাও। ওর বাবার কাছে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম ওকে আমরা ইণ্ডিয়ানের মতো মানুষ করবো। ওর আগ্রহ আছে—আমার স্বামীর চিন্তাধারাই ও পেয়েছে। উনি ওকে জিজ্ঞেস করতেন, 'আমার ভারতবর্ষ বড় গরীব, বড় কষ্ট সেখানে। পারবে তুমি কষ্ট সহ্য করতে?' ওইটুকু ছেলে চুপ করে থাকতো, হাসতো। আমার খোকা এখন সত্যিই কষ্টকে ভয় পায় না—আমার সন্তানদের আমি ননীর পুতুল করে মানুষ করিনি।"

বেণীমাধবের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেলেই মুস্কিল হতো। ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোনো আলোচনার বিষয় নেই। মাঝে মাঝে একমনে ঘরের কোণে বসে গ্রামোফোন রেকর্ডে বাঙলা গান শোনেন। ওঁর প্রিয় গান, 'আর রেখো না আঁধারে, আমার মাঝে তোমার আপনারে দেখতে দাও।' আমাকে দেখে ইঙ্গিতে বসতে বলেন, আমিও গান শুনি। গান শেষ হলে, সৌম্যমূর্তি বেণীমাধব জিজ্ঞেস করেন, "কেমন আছ, কোনো অসুবিধে নেই তো!"

তারপর বলেন, "ক'দিন থেকেই ভাবছি, ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় সমস্যাটা কী?"

বললাম, "জনসংখ্যাবৃদ্ধি। গণ্ডায় গণ্ডায় ছেলে হচ্ছে ভারতবর্ষে।"

বেণীমাধব বললেন, "আরও বড় সমস্যা, অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবান ভারতীয়রা নিজেদের দেশকে ভালবাসে না। দু' ধরনের ভাগ্যবান আছে ভারতে—ধনী ভাগ্যবান ও শিক্ষিত ভাগ্যবান। ধনীদের এতো দোষ যে তাদের কথা না তোলাই ভাল। কিন্তু শিক্ষিত মধ্যবিত্তদেরও দায়িত্ববোধ কোথায়? ধনীদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিয়ে তারা দিব্যি তাস-পাশা খেলছে। ফুটবল, ক্রিকেট, সিনেমা ও সঙ্গীতের নেশায় মেতে আছে। কেউ কেউ ভাবছে গড়ের মাঠে মিটিং করলেই, আর একদিন অস্তর ধর্মঘটের ডাক দিলেই মানুষের দুঃখ ঘুচে যাবে!"

আমি বেণীমাধবের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। তিনি বললেন, "আমি এখন বিদেশী, আমার কথা বলার অধিকার নেই। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রকৃত রূপটা শিক্ষিত ভারতীয়রাও জানে না। আসল ভারতবর্ষ মূঢ় ম্লান, তার ভাষা নেই, শক্তি নেই; এমনকি পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে তাও জানা নেই। মধ্যবিত্তরা যত দিন না সেই ভারতের মানুষদের নিজের ভাই বলে অনুভব করছে, যতদিন না শহুরে লোকের জানছে এবার দুর্ভিক্ষ হলে তাদেরই আগে মরতে হবে (যুগযুগান্তর ধরে দুর্ভিক্ষে গ্রামের মানুষরাই মরেছে) ততদিন ভারতবর্ষ জাগবে না। ভারতবর্ষের সব আছে। এমন অপূর্ব উপকরণ কোনো দেশে নেই, শুধু তাকে জাগাতে হবে।"

আমি দ্বিমত প্রকাশ করিনি। কারণ এখন তর্ক বাঁধালে ক্রিশ্চিন চুপচাপ বসে থাকবে। ওকে আমার অ্যাপার্টমেন্টে আসতে বলেছি, আমার অ্যাপার্টমেন্টের একটা চাবি ওকে দিয়েছি।

আমি কিছুতেই ভেবে পাই না, ইণ্ডিয়া সম্বন্ধে বেণীমাধব রায়ের এত মাথাব্যথা কেন? বেশ তো বাপু ছেলেপুলে নিয়ে আমেরিকান নাগরিক হয়ে সংসারধর্ম করছো।

কুমারকে পড়ানো মানে গল্প করা। ওই ছোকরাকে বেণীমাধব একখানা চলমান ভারতীয় বিশ্বকোষ করে তুলছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস, ধর্ম, অর্থনীতি গুলে খাচ্ছে কুমার। ওর সঙ্গে কথা বলতেই ভয় লাগে আমার—কোথায় ভুল ধরে বসবে।

ভারতবর্ষের সামাজিক ব্যাপারেও কুমার আগ্রহী। জিজ্ঞেস করে—মায়েরা ভারতবর্ষে সন্তানদের মঙ্গলের জন্যে এতোগুলো ষষ্ঠী পালন করে, অথচ ছেলেরা মায়ের সম্মানে কোনো স্পেশাল দিন অবজার্ভ করে না কেন?

আমি মাথা চুলকে বললাম, "কেন, মাতৃশ্রাদ্ধ রয়েছে। মায়ের মুখাগ্নি করার পর অনেক দিন খালি-পায়ে প্রায় সন্ন্যাসীর মতো থাকতে

হয়—আমরা বলি অশৌচ !"

মিসেস রায় আমাদের কথা শুনছিলেন। বললেন, "হাউ ইন্টারেস্টিং। আমি মরে গেলে কুমার এই রকম করবে, মাথা কামিয়ে ফেলবে !"

কুমার জিজ্ঞেস করলো, "বেঁচে থাকতে না করে, মরার পর করে লাভ ?"

মাথা চুলকে বললাম, "বেঁচে থেকে মায়েরা জানেন ছেলেরা শুধু হাড় জ্বালাবে। এই নিয়ম।"

বেণীমাধব এবার উত্তর দিলেন, "কুমার, সব দেশের মায়েরাই পরমসহিষ্ণুশীলা—সন্তানকে শুধু তাঁরা দিয়েই যান। আমাদের দেশে সাধারণ মানুষের কাছে জননী স্বর্গাদপি গরিয়সী। ভারতবর্ষে ছেলেরা প্রতিদিন কাজে বেরোবার সময় মাকে প্রণাম করে, আশীর্বাদ ভিক্ষে করে।"

কুমার বিস্ময়ে বলে, "হাউ সুইট।"

আমি আর ঘাঁটালুম না। ইস্কুলে রেজাল্ট বেরোবার দিন ছাড়া আর কোনো দিন মায়ের পায়ে হাত দিতাম না। তাও অঙ্কে একটু কাঁচা ছিলুম তাই। আর পিতৃ-মাতৃদায়ে খামকা চুল নেড়া করতে মোটেই ভাল লাগে না। আজকাল অনেকে তো চুলের বদলে মূল্য ধরে দিচ্ছে।

এই মূল্য ধরে দেওয়ার নিয়মটা ইণ্ডিয়ার খুব ভাল—আধুনিক মানবসভ্যতায় ভারতবর্ষের অন্যতম অবদান। যা পালন করতে প্রাণ চাইছে না, তার বদলে দাম ধরে দাও। টাকায় ভগবান পর্যন্ত ভিজে যান। স্বাধীনতার পর আমরা আরও এগিয়ে গিয়েছি। মূল্য ধরে দেওয়ার এই নিয়মটা যা একদিন কেবল ধর্মে এবং সামাজিকতায় সীমাবদ্ধ ছিল, তাকে আমরা ব্যবসা, বাণিজ্য, শাসন, রাজনীতি, ন্যায়নীতি সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছি। অনেকে এর মধ্যে অন্যায় দেখে, আমি তো এর মধ্যে কিছু অধর্ম দেখি না। আমি কিছু মূল্য ধরে দিয়ে আই-এ পরীক্ষার

কোশ্চেন ফাঁস করেছিলাম। টাকা দিয়ে বি-এ পরীক্ষার হলে বই থেকে টুকেছিলাম। আর কিছু মূল্য ধরে দিয়ে একখানা উত্তরপত্র পুরোপুরি পাল্টে দিয়েছিলাম—ফলে আমার বি-এ সার্টিফিকেট লাভ হয়েছে। স্বয়ং লাটসাহেব ঝলমলে গাউন পরে আমাকে ডিগ্রি দিয়েছেন। দুনিয়ার কোনো হারামজাদার সাধ্য নেই বলে আমি বি-এ পাশ নই। এম-এ পরীক্ষার সময় রেট নিয়ে গণ্ডগোল হলো, কথা কাটাকাটি করতে গিয়ে এমন মেজাজ খিঁচড়ে গেল যে মূল্য ধরে দেওয়া হলো না। ফলে গার্ড আমাকে পরীক্ষার হল থেকে বার করে দিলে; রিপোর্ট করলে। আমার এম-এ পাশ করা হলো না। সুতরাং আমি এম-এ নই। সামান্য ক'টা টাকা খরচ করিনি বলে এতোদিন পরেও আমাকে বিদেশে বিপদে ফেলা হলো। অথচ আমি চ্যালেঞ্জ করছি, দেশের গুণীজ্ঞানী যাঁরা সব মূল্য ধরে দিয়ে আমাদের মাথায় বসে আছেন—তাঁদের রাষ্ট্রসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় বসানো হোক। দেখি ক'জন পাশ করেন।

কুমারকে এই সব কথা বলিনি। ছোকরার ইণ্ডিয়া সম্বন্ধে আগ্রহ আছে বলেই আমার কিছু অর্থাগম হচ্ছে। ইণ্ডিয়া সম্বন্ধে এখনও কিছু লোকের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা আছে বলেই তো আমরা বিনাপয়সায় এবং ধারে গম-টম পাচ্ছি। ইণ্ডিয়া যদি চালাক হয়, তাহলে আমার বাল্যবন্ধু মণ্টার বাবার মতো স্রেফ ধাপ্পা দিয়ে বিশ্বের বাজারে আরও অনেক দিন চালিয়ে যেতে পারবে।

কিন্তু বেণীমাধবের দিকে তাকিয়ে দেখুন। এসব বুঝবে না। বিদেশে এলে এই স্বদেশী ভাবটা দেখছি বেড়ে যায়।

বেণীমাধব বলছেন, "আমি হয়তো ততদিন বেঁচে থাকবো না, কিন্তু তোমরা দেখে যাবে ভারতবর্ষ তার হারিয়ে-যাওয়া গৌরব ফিরে পেয়েছে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক দেশের এই যে বিরক্তি, তার কারণ হিংসা। তারা জানে ভারত তাদের ছাড়িয়ে যাবে। আর যেদিন

ভারতবর্ষ সত্যিই আবার জাগবে সেদিন সত্যিই পৃথিবীর সভ্যতার নতুন পরিচ্ছেদ শুরু হবে।"

কুমার প্রশ্ন করেছিল, "*If India dies who lives ? If India lives who dies ?* কে বলেছিলেন কথাটা ?"

আমার দিকে তাকিয়েছিল কুমার। কে আবার এই কথা বলে ফ্যাসাদে ফেলে গেল আমাকে।

বেণীমাধব আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "স্বামী বিবেকানন্দ, তাই না ?"

আমি বিজ্ঞের মতো বললাম, "তাই তো মনে হচ্ছে।"

আসলে আমি জানি না। কোটেশনের বইতে জায়গা পাবার জন্যে কত লোক কত আবোলতাবোল কথা বলে গিয়েছে, তা মনে রাখা আমাদের মতো আধুনিক ইয়ংম্যানের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা সেই শক্তি দিয়ে 'জোক' মুখস্থ করি—যেসব 'জোক' দিলে মেয়েরা হেসে গড়িয়ে পড়বে, কাছে সরে এসে বলবে, "আরও দু'একটা জোক দাও অনি।" এরপরে আরও দু'চারটে জোক ছাড়তে পারলে আমার নগদ লাভ হবে। তা না, ইণ্ডিয়া মরলে দুনিয়ায় কে বাঁচবে ? পৃথিবীর ম্যাপ থেকে ইণ্ডিয়া উঠে গেলে দুনিয়ার কিছুই এসে যাবে না। যেমন চলছে ঠিক সেইভাবেই চলবে। কত দেশ এইভাবে মুছে গিয়েছে, ইতিহাসের হিসেব খুলে দেখো না বাপু। কিন্তু কার মাথাব্যথা হচ্ছে ? সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, আমি বাঁচবো কিনা। পাঁচটি সজাগ ইন্দ্রিয় নিয়ে আমি বাঁচলেই হলো। এইটেই আমার মনের কথা, আমি স্বীকার করছি। কিন্তু বেশীর ভাগ ইণ্ডিয়ান স্বীকার করবে না—তাঁদের ঠোঁটে এক কথা, পেটে আর একরকম।

পড়ানোর পরেও বেণীমাধব আমাকে বসতে অনুরোধ করেছিলেন। কুমার অন্য কাজে চলে গিয়েছে। বেণীমাধব বললেন, "এমন এক সময় ছিল যখন বিবেকানন্দের কথাটা শুনলে আমি হাসতাম। কিন্তু এখন

আমি হাসি না। আমি বিশ্বাস করি ভারতবর্ষের কিছু দেবার আছে পৃথিবীকে। ভারতবর্ষের বাইরে এলে তবে এই উপলব্ধি হয়—বিবেকানন্দও বোধ হয় এই সত্যটা আমেরিকায় এসে বুঝেছিলেন।"

"সেই জন্যেই তো ইণ্ডিয়ার সব লোক 'ফরেন' যেতে চায়। ইণ্ডিয়ার সমস্ত বিখ্যাত লোক ফরেনে যাবার পর বিখ্যাত হয়েছেন। আর বিবেকানন্দ তো ভারতবর্ষকে আমেরিকার প্রীতি উপহার!"

"কথাটা বলেছো ভাল," জানালেন বেণীমাধব।

আমি ওঁকে খুশী করবার জন্যে বললাম, "এই যে আপনি এতদিন দেশে ছিলেন, কষ্ট করেছেন, দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পাননি। আজ আপনি দেশের বাইরে চলে এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, দেশের লোকরা আপনার নাম ভাঙাতে চায়। আজ আপনি যদি নোবেল প্রাইজ পান, দেখবেন আপনাকে নিয়ে ইণ্ডিয়া কী করে। খবরের কাগজে, রেডিওতে, মিটিঙে, সরকারী দপ্তরে দিনের পর দিন নাচানাচি চলবে।"

বেণীমাধব কিন্তু তেমন খুশী হলেন না। গম্ভীরভাবে বললেন, "গরীবের সংসারে সব সময় তাই হয়ে থাকে। এটা ইচ্ছে করে কেউ করে না। হতাশার মধ্যে কোথাও একটু আশার স্ফুলিঙ্গ দেখলে তারা একটু বেশী হৈ চৈ করে ফেলে। নিজেদের ওপর আমরা এখনও বিশ্বাস করতে শিখিনি, তাই সায়েবরা কাউকে বড় বললে আমরা নিশ্চিন্ত হই।"

বললুম, "ভারতবর্ষ গোল্লায় যেতে বসেছে। শুধু একটা জিনিস বুঝি না, এর মধ্যেও কোথা থেকে আপনার মতো মানুষের জন্ম দেয় ভারতবর্ষ!"

বেণীমাধব সন্তুষ্ট হলেন না। অভিমানে তাঁর চোখ ছলছল করে উঠলো। বললেন, "আমার মতো হাজার হাজার মানুষ জন্মাচ্ছে ভারতবর্ষে। তারা সুযোগ পায় না, শিক্ষা পায় না, উৎসাহ পায় না। তাই অকালে শুকিয়ে যায়।"

আমি মনে মনে বললাম, তোমার এ রোগ সারবার নয়।

ভারতপ্রেমটা তোমার এক ধরনের বিলাসিতা। যদি এত প্রেম, যাও না রাজবল্লভ সাহা সেকেণ্ড বাই লেনে ফিরে। দু'মাসে তোমার কী হাল হয় দেখি।

এ-সব এই প্লেনে বসে কুমারের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে যাচ্ছে। কতদিন ওদের বাড়িতে গিয়েছি, আর পড়ানোর নাম করে গল্প করেছি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ওকে জ্ঞান দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বই এবং পত্র-পত্রিকা থেকে কুমার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমার থেকে অনেক বেশী জেনে বসে আছে।

প্লেনের নতুন সেবিকাগুলো সত্যি সেবাপরায়ণা। আইন-টাইনের কথা না ভেবে আমাকে ন্যায্য দামে পানীয় সরবরাহ করে যাচ্ছে। আমি টেনে যাচ্ছি।

ওদিকে নিমাই মুখুজ্যে কেমন সতী সেজে বসে রয়েছে! প্লেনে ওঠা পর্যন্ত এক পেগও ছোঁয়নি। টুলটুলের কাছে ওঁর নিজের ইমেজ তৈরী করছেন। হাজার হোক গেরস্ত বাঙালী মেয়ে টুলটুল—যদি মাল খেতে দেখলে বেঁকে বসে। আমার খুব ইচ্ছে করছে এই অবস্থায় গিয়ে নিমাই মুখুজ্যেকে একটা চুমু খাই। বলি, "আমেরিকা থেকে তাড়িয়েছ তাই বলে কী নদের চাঁদকে প্রেম দেব না?" তারপর আর একটা প্রশ্ন করবো, "টুলটুলের নামে দিব্যি করে বলো তো, মাল না খেয়েই এই তেল-চকচকে চেহারাখানি হয়েছে।" তারপর হয়তো দু'একটা ঘুষোঘুষি হতে পারে। কিন্তু আমিও বাবা রাজবল্লভ সাহা লেনের মাল, এককালে ওয়েস্ট-এণ্ড ক্লাবে বক্সিং প্র্যাকটিশ করেছি।

কিন্তু এরই মধ্যে হংকং-এ নামবার সময় হয়ে গিয়েছে। ওই কচি কচি জাপানী মেয়েটা মিঠু-মিঠু ইংরিজীতে বেল্ট বাঁধবার অনুরোধ করছে। আমি বাপু নিজে বেল্ট বাঁধছি না। তোমাকে নিজে এসে বেঁধে দিতে হবে।

কুমার ঘুমিয়ে পড়েছিল। হংকং-এ ঝাঁকুনি দিয়ে প্লেন থামতেই জেগে উঠলো। ওর ইচ্ছে ছিল প্লেনেই বসে থাকে। কিন্তু আমি দেখলাম কুমারকে নিয়েই আমার বেরনো উচিত। যদি হঠাৎ একটা ঘুষিতে নিমাই মুখুজ্যের মুখের জিওগ্রাফি পাল্টে দিতে ইচ্ছে করে আমার তাহলেই কেলেংকারী। ওঁর শখ কত! উনি টুলটুলের হিস্ট্রি জেনেছেন, এখন বৃদ্ধ বয়সে ওর জিওগ্রাফি জানতে চান। আমার মেজাজ হঠাৎ বেঁকে বসতে পারে। কুমার থাকলে আমাকে সামলে রাখতে পারবে।

একরকম টেনেটুনেই কুমারকে লাউঞ্জে নিয়ে এলাম। ওকে পাশে বসিয়ে কফির অর্ডার দিলাম। বিনা পয়সায় কফি আনবে। এরোপ্লেন কোম্পানি যাত্রীদের জামাই-আদরে রেখেছে। এই এত বিমান কোম্পানি থাকতে ওদের টিকিট কিনে ওদের ধন্য করে দিয়েছি।

কফির কাপটা সামনে রেখে হিসেব মেলাবার চেষ্টা করছি—কবে প্লেনে চড়েছিলাম, এখন কী বার? এই ঘন ঘন ঘড়ির সময় পাল্টিয়ে অঙ্ক-টঙ্ক গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। কুমাব বললে, "মাস্টারমশায়, আপনার কিছু হারিয়েছে নাকি?"

একটু নেশার ঘোরে ছিলুম, মাঝে মাঝে পকেটে হাত দিচ্ছিলাম, তাই কুমারের এই প্রশ্ন। বললাম, "দেখো না পৃথিবীর কাণ্ডটা। আজ জাপানে আসবার পথে যেমনি আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা অতিক্রম করলাম অমনি ক্যালেণ্ডারের একটা তারিখ বাড়িয়ে দিতে হলো। ছিল বুধবার হঠাৎ হয়ে গেল বৃহস্পতিবার। প্রতিটি মুহূর্ত কত মূল্যবান, আর একটা পুরো দিন চুরি হয়ে গেল!"

হাহা করে হেসে ফেললে কুমার। "তাই বুঝি আপনি হিসেব মেলাতে পারছেন না?"

কুমার ছোকরা যে কেন ইণ্ডিয়াতে যাচ্ছে তা জানা দরকার। ওর নাম যতই ইণ্ডিয়ান হোক, দেখলে সায়েব ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না। সুতরাং ইণ্ডিয়ার ইণ্ডিয়ানরা, যারা সাহেব দেখলেই গদ্‌গদ, তাদের

কাছে খুব খাতির-যত্ন পাবে। আর যদি একদিন রাজবল্লভ সাহা লেনে ওকে নিয়ে যাই, তা হলে তো রাস্তায় ভিড় জমে যাবে। আমার খাতিরও কম হবে না।

কুমারকে বলেই বসলাম, "আমি কেন দেশে ফিরছি জান ?"

বেচারা সত্যি কিছুই জানে না। বললে, "আপনার কাজকর্ম তো শেষ করে ফেলেছেন। ঘরের ছেলেকে ঘরে ফিরতে দেখলে কেউ কেউ জিজ্ঞেস করে না, কেন ঘরে ফিরছো ?"

ছোকরা কিছু জানে না দেখে একটু ভরসা পেলাম। এবার বললাম, "তুমি ভারতবর্ষে ক'দিন থাকবে ?"

কুমার হাসলে। বললে, "সে অনেক কথা। প্লেনে বসে আপনাকে সব বলবো।"

ইতিমধ্যে একটা চীনা হোস্টেস আমাদের প্লেনে ফিরে যেতে বলে গেল। এবার প্লেন ছাড়বে। কুমার সঙ্গে সঙ্গে উঠতে যাচ্ছিল। আমি ওকে আটকে রেখে বললাম, "আরও একটু চীনে হাওয়া খেয়ে নেয়া যাক। প্লেনের লোকগুলো ওইরকম ধড়ফড় করে।"

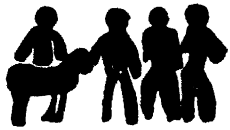
তারপরও বোধ হয় অনেকক্ষণ বসেছিলাম আমরা। কারণ প্লেন কোম্পানির আর একটা লোক আমাদের খুঁজতে এল হন্তদন্ত হয়ে। আমরাও ছুটলাম। এবং এই হন্তদন্ত ভাবটাতেই বিপদ ঘটলো। প্লেনের সিঁড়ির কাছে কিছু একটা পড়েছিল বোধ হয়—তাতেই পিছল খেয়ে হুড়মুড় করে পড়লো কুমার। আমি ব্যাপারটার জন্যে মোটেই তৈরি ছিলাম না। নিজেকে সামলে নিয়ে ওকে টেনে তুললাম। ওই চেহারা টেনে তুলতে কম পরিশ্রম নয়।

বেচারা কুমার ওরই মধ্যে আমাকে ধন্যবাদ দিলে। তারপর খোঁড়াতে লাগল। বললাম, "লেগেছে নাকি ?"

"না, তেমন কিছু নয়।"

বললাম, "দেখো, এখানে ডাক্তার-টাক্তার পাওয়া যাবে।"

কুমার উত্তর দিলে, "কিছুই দরকার হবে না।" এবার আমার কাঁধে ভর দিয়েই সে প্লেনের ভিতর ঢুকে পড়ল।



গুরুনিতম্বিনী বিমানবালিকাটি আবার বেল্ট বাঁধার গৎ মুখস্থ বলছে। ক্যাপ্টেনের পক্ষ থেকে নতুন যাত্রীদের স্বাগত জানাচ্ছে। আকাশের কত উঁচু দিয়ে উড়ে যাবে তা বলছে—সেসব শুনে শুনে আমার কান পচে গিয়েছে।

আমি কুমারের কথা ভাবছি। আমি যে পরের কথা ভাবতে অভ্যস্ত মোটেই তা নয়। আমার নিজের কথা ভেবেই কূল-কিনারা পাই না। তবু যখন চোখের সামনে কারও পদস্খলন হয় তখন একটু-আধটু করতে হয় বৈকি।

আমাদের প্লেন আবার শূন্যে উঠেছে। কেমন ভালোমানুষের মতো ভেসে রয়েছে, কে বলবে বাইরে থেকে একে দেখলে কানে তুলো দিতে হতো! বেশী নয়, মাত্র মিনিটে দশ মাইল করে ছুটছে বোয়িং কোম্পানির এই দানবটা।

কুমারের মুখটা দেখেই মনে হলো যন্ত্রণা পাচ্ছে খুব। কিন্তু ছোকরা স্বীকার করলে না। আমি হলে তো এই তালে সুন্দরী হোস্টেস ডাকিয়ে ক্ষত স্থানের চার পাশে হাত বুলিয়ে নিতাম!

কুমারকে বললাম, "যন্ত্রণা বাড়ছে নাকি?"

সে স্বীকার করলে না।

ইতিমধ্যে ডিনার আসতে শুরু করেছে। সামনের টেবিলটা পেতে, তার ওপর হাল্কা প্লাস্টিকের ট্রে নামিয়ে দিয়ে গেল সুন্দরী। প্লেনের এই

মজা—মজবুত অথচ হাল্কা হতে হবে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণকে কলা দেখিয়ে প্লেনকে উপরে আনতে হয় বলে পাইলট সব সময় ওজনের খোঁজ রাখেন। মায় এই যে ললনাটি আমাকে পরিবেশন করছে, ওকে দেখুন—অমন পুতুল-পুতুল চেহারা, অমন গুরুস্তনী, কিন্তু কেমন হাল্কা প্রজাপতির মতো এদিক থেকে ওদিক যাতায়াত করছে।

কুমার ছোকরা, এইসব দিকে একটু নজর দাও, তা হলে ব্যথা কমে যাবে। আমার যেবার পদস্খলন হলো, ভাঙা ফিমারের যন্ত্রণা ভুলবার জন্য কত সুন্দরী সুন্দরী মেয়ের কথা চিন্তা করতে আরম্ভ করেছিলাম। এইসব চিন্তা যে বেদনানাশক বটিকার কাজ করে তা এই তরুণ যুবককে বোঝানো দরকার। এতোকাল আমেরিকায় আছ, আর নারীঘটিত এই সামান্য কথাগুলো জানো না, এই বা কেমন করে হয়? কিন্তু কুমার এরই মধ্যে আবার নেহরুর 'ডিসকভারি অফ ইণ্ডিয়া' খুলে বসে আছে।

আমার ইচ্ছে করছিল ছোকরাকে সোজাসুজি বলি, বাপু একেবারে ইউজলেস বই। সেই পিতামহ ভীষ্ম থেকে আরম্ভ করে কৃষ্ণ, বুদ্ধ, মহাবীর, শঙ্করাচার্য, বিবেকানন্দ যা পারলে না, আর তুমি এলাহাবাদে জন্মে, কেমব্রিজে পড়াশোনা করে আর ময়দানে বড় বড় মিটিং করে ইণ্ডিয়া আবিষ্কার করে ফেলবে! অমন যে গান্ধী তিনিও এই ভারত আবিষ্কার করতে গিয়ে বেঘোরে প্রাণটা হারালেন। ইণ্ডিয়া অত সোজা জিনিস নয় বাপু। ভগবান এর পিছনে অনেক কেরামতি খাটিয়েছেন।

ডিনারে কুমার প্রায় কিছুই খেলো না। আমি কিন্তু কিছুই ছাড়লাম না। যতটা বেশী করে পারি খেয়ে নেওয়া ভাল, ইণ্ডিয়ার একটা মিল বাঁচাতে পারলেও লাভ।

আমাদের পাশের সীটটা খালি হয়ে গিয়েছে। কার্ল ছোকরা কী ভেবে হংকং-এ নেমে গিয়েছে। হংকং-এর নাইট-লাইফ সম্বন্ধে একটা বই পড়ছিল ছোকরা, তাতেই বোধ হয় মনে কিছু শখ চাগিয়েছে। এরোপ্লেনকে এরা শহরের ট্রাম-বাস মনে করে—হাওড়া স্টেশন থেকে

টিকিট কিনেছে ভবানীপুরের, হঠাৎ কি খেয়াল চাপল, নেমে গেল এসপ্ল্যানেডে। আর বলিহারি যাই মার্কিন প্রকাশকদের। ট্যুরিস্টরা কোন দেশে কোন রাস্তায় কত দামে কেমন বান্ধবী পেতে পারেন তাও খোঁজ করে বইতে লিখে দিয়েছে।

এবার একটু প্রাণ খুলে আড্ডা মারা যেতে পারে কুমারের সঙ্গে।

কুমার বইটা কোলের ওপর রেখে প্লেনের সীলিঙের দিকে তাকিয়ে আছে। বললাম, "কী ভাবছো এতো?"

হাসলে কুমার। বললে, "বাবার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।"

অন্য কোনো সমর্থ আমেরিকান এই কথা বললে, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতাম, "পিঁয়াজি ছাড়ো। গার্ল ফ্রেণ্ডের কথা ভাবছো—শেষ যখন তাকে নিয়ে মোটরগাড়ি-রূপ-মন্দিরের গর্ভগৃহে শুয়েছিলে সেই দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠছে, আর বুক চড় চড় করছে।" কিন্তু কুমারের মুখে এমন একটা সরল ভাব আছে, এসব বলতে ইচ্ছে করছে না।

বললাম, "বাবা সঙ্গে থাকলে খুব আনন্দ হতো তোমার, তাই না?"

"সে তো বটেই। কিন্তু তা হবার নয়, বাবার পক্ষে ভারতে আসা কোনদিনই সম্ভব হবে না।"

কুমারের কথায় চমকে উঠলাম। তাহলে বেণীমাধবও কি ডুবে ডুবে জল খেতে গিয়ে এমন কিছু করে বসেছিলেন যে, ইণ্ডিয়াতে আসার ভিসা মিলবে না তাঁর কোনোদিন! যেমন, অনির্বাণ চ্যাটার্জির নাম আমেরিকানদের কালো খাতায় উঠে গিয়েছে। বুড়ো স্মিথ নিশ্চয় গুছিয়ে একখানা চিঠি গভরমেন্টকে লিখে দিয়েছে, যার সাবজেক্ট: মিস্টার অনির্বাণ চ্যাটার্জি।

কুমার এবার বলতে আরম্ভ করলে। বললে, "বাবা যে ভারতবর্ষকে রক্ত দিয়ে ভালবাসেন তা ছোটবেলা থেকেই জানতাম। আমার যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আগ্রহ তা বাবার কাছ থেকেই পেয়েছি। আমার মা তাতে যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছেন। মা বলতেন—তোমার বাবা

ছোটবেলায় কত কষ্ট পেয়েছেন। তোমার ঠাকুমা অতি ভাল মানুষ ছিলেন। অসহায় বিধবা হয়েও তিনি ছেলেকে বড় করার স্বপ্ন দেখেছিলেন।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তারপর?"

কুমার বললে, "আমাদের বাড়ির পাশে মিস্টার ইউমোফপুলাস-এর বিরাট বাংলোটা দেখেছেন?"

দেখেছি বৈকি ওঁর বাংলোটা। জাতে গ্রীক ভদ্রলোক। বুড়ো ইউমোফপুলাসকেও দেখেছি। ব্যাচেলর মানুষ। এককালে বোধ হয় খুব সুপুরুষ ছিলেন। ওঁর চোয়ালের দিকে আমার নজর পড়ে যেতো। দেখলেই মনে হতো বেজায় গোঁয়ার। যা বলবে তাই করে ছাড়বে।

কুমার বললে, "ইউমোফপুলাস খুড়োর সঙ্গে বাবার খুব ভাব ছিল। বাবা বিজ্ঞানের লোক, আর ইউমো সামান্য-শিক্ষিত ব্যবসায়ী। দু'জনে প্রায় একই সময়ে আমেরিকায় এসেছিলেন। ইউমো এতকাল এখানে থাকলেন, কিন্তু ওঁর ইংরিজীর তেমন উন্নতি হলো না। সেই ভাঙা ভাঙা উচ্চারণ, 'ট'-এর জায়গায় 'ত' বলা, এবং ইংরিজি শব্দের জন্য হাতড়িয়ে বেড়ান।"

"কিন্তু বাবার তাতে বিশেষ অসুবিধে হতো না। বুড়োর খেয়াল হলেই চলে আসতেন আমাদের বাড়িতে। আর দু'জনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতেন। মানে ইউমোই বেশী কথা বলতেন, আর বাবা চুপচাপ শুনে যেতেন।"

একটু থামলো কুমার। তারপর আবার বললে, "পাড়াতে ইউমোর বদনাম ছিল। অনেক রোজগার করে, কিন্তু খরচে হাত নেই। নিজের জামা কাপড়েও খরচ করতেন না উনি। বাবা অবশ্য ওসব কথা কানে তুলতেন না।"

"তারপর ব্যাপারটা ঘটলো। দেখলাম একদিন ইউমো এসে বাবার ঘরে ঢুকলেন। মাকেও ডাকলেন বাবা। আমি ওপরের ঘরে লেখাপড়া

করছিলাম। অনেকক্ষণ পরে দেখলাম, ইউমো বেরিয়ে গেলেন আমাদের বাড়ি থেকে।"

মা উপরে উঠে এলেন। বললাম, "কী ব্যাপার? আজ যে ইউমো খুড়ো আর উঠতেই চাইছিলেন না।"

মা বললেন, "ইউমো আজ আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছিলেন। ইউমো আমেরিকা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন।"

"মানে?" আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করি।

মা বললেন, "আশ্চর্য মানুষ এই ইউমো। আজ নিজের জীবনের গল্প বলে গেলেন। ব্যাগে একটা স্যুট ভরে নিয়ে একদিন গ্রীস ছেড়ে ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়েছিলেন। তারপর জীবনের স্রোতে ভাসতে ভাসতে হাজির হয়েছিলেন এই নিউটন শহরে। নিজের কাছে পণ করেছিলেন একদিন আবার দেশে ফিরে যাবেন। কিন্তু খালি হাতে নয়—সঙ্গে থাকবে মিলিয়ন ডলার। তারপর বহু বছর কেটে গিয়েছে। নিজের ব্যবসাতে অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন ইউমো। গতকাল সন্ধ্যে সাতটায় নাকি ইউমোর স্বপ্ন সফল হয়েছে—পুরো দশ লক্ষ ডলারের মালিক হয়েছেন তিনি। ইউমো বললেন, 'অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। যখন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তখন জানতাম না, মিলিয়ন ডলার-এর মালিক হতে এত সময় লাগবে। মধ্যে তো আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম—ভেবেছিলাম, কোনোদিনই স্বপ্ন সফল হবে না। অলমাইটি গড শেষ পর্যন্ত দয়া করেছেন। আর একটুও দেরি করবো না আমি। আমার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে ফেলেছি আজ। দশ লক্ষ ডলার নিয়ে এখন আমি ফিরে যাবো গ্রীসে আমার গ্রামে।"

মা আবার বললেন, "আশ্চর্য। ইউমোর মনে যে এতো পরিকল্পনা ছিল কে জানতো। নিজের দেশের কথা ভেবেই উনি অমন ভেবেচিন্তে খরচ করতেন।"

কুমার বলে চললো, "মা'র সঙ্গে কথা শেষ করে আমি নিচে নেমে

এসেছিলাম। দেখলাম, বাবা বসবার ঘরটা প্রায় অন্ধকার করে রেখেছেন। একটা মাত্র টেবিল-ল্যাম্প টিমটিম করে জ্বলছে।"

আবছা আলোয় কুমার বুঝতে পারলো, বাবা পাথরের মতো নিস্তব্ধ হয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন। কুমারের মনে হলো বাবা বেশ বিচলিত হয়েছেন। কুমার কাছে এগিয়ে এসে ডাকল, "বাবা।"

বেণীমাধব যেন কোনো গভীর অন্ধকার গহ্বর থেকে উত্তর দিলেন, "কে? কুমার? আয়, বোস।"

কুমার বাবাকে কখনও এমন বিচলিত অবস্থায় দেখেনি। বাবাকে দেখে তার বুক ফেটে যাচ্ছে। বাবাকে সে যে খুব ভালবাসে। কুমার বাবার গায়ে হাত দিয়ে বললে, "কী ভাবছো, বাবা?"

বেণীমাধব নিজের আবেগ সংযত করার ব্যর্থ চেষ্টা করে বললেন, "আজ আমার মায়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, কুমার।"

"সে তো মাঝে মাঝে মনে পড়বেই। মা বলে কথা।"

বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বেণীমাধব বললেন, "অনেকদিন মা'র ছবিটা অস্পষ্ট হয়েছিল, আজ তাঁকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। বাবা মারা গিয়েছিলেন সেই ছোটবেলায়। মায়ের কাছেই মানুষ হয়েছিলাম। মা'র তো ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। মা বলতেন, "গরীবের তো চোখ আর হাত ছাড়া কিছুই নেই। এমন পড়বি আর লিখবি যাতে কেউ না পারে তোর সঙ্গে। তোকে যে বড় হতে হবে।"

"আমি চুপচাপ শুনে যেতাম। মা বলতেন, সিদ্ধেশ্বরী মা'র আশীর্বাদে তুই যদি বড় হোস তা হলে আমি বেঁচে না থাকলেও শান্তি পাবো। মা বলতেন, যদি কখনও বড় হোস, গরীবের দুঃখের কথা মনে রাখিস। ওদের জন্যে একটু চিন্তা করিস।"

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বেণীমাধব বললেন, "মা বলতেন, আর আমি শুনে যেতাম। কখনও কী ভেবেছিলাম, মা আমার বিনা চিকিৎসায়

শেষ হয়ে যাবেন? মা'র শরীর অনেকদিন খারাপ হচ্ছিল। কিন্তু আমাকে বলেননি। আমার পরীক্ষা খারাপ হয়ে যাবে, আর আমি টাকা পাবো কোথায়? অসুখের প্রথম দিকে নিজেই যেতেন গঙ্গাধরবাবুর হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানায়। গঙ্গাধরবাবু রিপন কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন, আর অবসর সময়ে বিনা পয়সায় ওষুধ দিতেন। মা যখন আর উঠতে পারতেন না, তখন আমাকে পাঠিয়েছেন ওষুধ আনবার জন্যে। গঙ্গাধরবাবু বলেছিলেন, তোমার মায়ের রোগটা ভাল মনে হচ্ছে না। রক্ত, থুতু এসব পরীক্ষা করানো দরকার। আর চাই ভাল খাবার।"

"কিন্তু কোথা থেকে আসবে এসব? অনেক টাকা চাই। দু' একজন অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারের কাছে গিয়েছি। তাঁরা বলেছেন, মনে হচ্ছে টি-বি। রাজরোগের রাজ চিকিৎসা। পারবে টাকা জোগাড় করতে? তার থেকে চেষ্টা করো কোনো স্যানাটরিয়ামে, যদি ফ্রি বেড পাও। কত লোকের দরজায় ঘুরেছি, কতভাবে চেষ্টা করেছি, মায়ের যদি একটু চিকিৎসা হয়।"

বেণীমাধবের এবার ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা। তাঁর মা যেন এই মুহূর্তে পাশের ঘরে অর্থাভাবে বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছেন।

বেণীমাধব বললেন, "মায়ের মৃত্যুতে আমি পাথর হয়ে গিয়েছিলাম। একটুও কাঁদিনি। মায়ের মৃতদেহ স্পর্শ করে, মাথাটা আমার কোলে রেখেই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যে দেশে আমার মায়ের চিকিৎসা হলো না, সেখান থেকে আমি চলে যাবো, এবং কখনও ফিরবো না। কখনও না।"

কুমার দেখলো বাবার চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছে। এতোদিন পরে বার্ধক্যের দ্বারে এসে বেণীমাধব চোখের জল ফেলে মনকে শান্ত করছেন।

বেণীমাধব বললেন, "বাবা, এ আমার স্বেচ্ছা-নির্বাসন। খ্যাতি, অর্থ, প্রতিপত্তি আমি সবই পেয়েছি। ফিরে পাইনি শুধু আমার মাকে।

মাঝে মাঝে ভেবেছি, ছেলেমানুষের মতো অমন প্রতিজ্ঞা আমার না করাই উচিত ছিল। কিন্তু মাকে স্পর্শ করে আমি যা বলেছি, তা আমি ফিরিয়ে নিতে পারি না। ভারতবর্ষ আমার দেখা হবে না। ভারতবর্ষ আমার মায়ের মতো—যতই ভালবাসি, মা আমায় আর দেখা দেবেন না।"

প্লেনটা এবার একটু বাম্প খেল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, কলকাতায় পৌঁছতে তেমন দেরি নেই। হোস্টেসগুলো কাজকর্ম গুছিয়ে পিছনের সীটে একটু নিদ্রাসুখ উপভোগ করে নিচ্ছে।

আমি ফ্যাল ফ্যাল করে কুমারের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। শুনছি তার বাবার গল্প।

কুমার বললে, "আমি আর কোনো কথা না বলে ওপরে উঠে এসেছি। বাবাকে এই সময় একা থাকতে দেওয়া উচিত।"

মা ওপরে উল বুনছিলেন। আমাকে গম্ভীর মুখে উঠে আসতে দেখে বললেন, "ইণ্ডি, তোর চোখ দুটো ছলছল করছে কেন?"

বললাম, "বাবাকে আজ কাঁদতে দেখলাম; ইউমো খুড়োকে দেশে ফিরে যেতে দেখে বাবার মনটা কেমন হয়ে গিয়েছে।"

মা আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমার মা কেমন মিষ্টি হাসে জানেন তো? মাকে বললাম, আমার বাবার মায়ের গল্প। দেখলাম, উনি সবই জানেন।

উলের কাঁটা বোনা বন্ধ না করেই মা বললেন, "ইণ্ডি, তুই যখন অনেক ছোট, তখন তোর বাবাকে কথা দিয়েছিলাম, তুমি যা পারোনি, তোমার সন্তান তাই করবে। সে ইণ্ডিয়াতে ফিরে গিয়ে মানুষের সেবা করবে।"

মা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোর ইণ্ডিয়াকে ভাল লাগে না?"

আমি বললাম, "খুব ভাল লাগে মা। ওই তো, বাবা যা বলেন, ইণ্ডিয়াতে সব আছে, শুধু একটু স্ফুলিঙ্গ দরকার। কোটি কোটি

অর্ধাহারী, অনাহারী, দুর্বল রুগ্ন মানুষগুলো আবার জেগে উঠবে।"

মা বললেন, "তোকে তো সেইভাবেই মানুষ করেছি। বিজ্ঞানে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছিস। তোর যদি ইচ্ছে করে, তুই যেতে পারিস ভারতবর্ষে—ওখানের জীবনের সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে ওদের ভালবাসতে পারিস। ওদের বলতে পারিস, আমার চোখমুখ গায়ের রঙ দেখে ভাববেন না আমি বিদেশী। আমার বাবার নাম—বেণীমাধব রায়। রাজবল্লভ সাহা সেকেণ্ড বাই লেনে যাঁর জন্ম হয়েছিল, যাঁর মা ওই পাড়াতে রাঁধুনিগিরি করতেন, মুড়ি ভাজতেন, ঠোঙা তৈরি করতেন। যদি তারপরও জিজ্ঞেস করে, তোমরা তো আমেরিকায় খুব সুখে থাকো, এখানে কেন? তখন বলিস, বাবা পাঠিয়েছেন।"

কুমার বললে, "বাবা আমাকে সর্বস্ব লিখে দিয়েছেন। তাঁর সমস্ত জীবনের সঞ্চয় আমার আয়ত্তে, যাতে ভারতবর্ষে আমি স্বাধীন থাকতে পারি, আমাকে চাকরি করতে না হয়। তারপর আমার যা ভাল লাগবে, তাই করবো।"

আমি শ্রীঅনির্বাণ চাটুজ্যে কান দিয়ে শুনে যাচ্ছি, কিন্তু সব কথা মনে ঢুকতে দিচ্ছি না। এসব কথা ব্রেনে ঢুকতে আরম্ভ করলেই আদর্শবাদ এসে যাবে। আর এই শালা আদর্শবাদ হলো ঘরের শত্রু বিভীষণ—আপনাকে শান্তিতে ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করতে দেবে না। সব সময় বুকের মধ্য থেকে আপনাকে খ্যাচ খ্যাচ করবে।

কুমার এবার সীট ছেড়ে উঠবার চেষ্টা করলে। কিন্তু পায়ে বেশ ব্যথা পেয়েছে। কলকাতায় নেমেই ডাক্তার দেখাতে হবে। হাড়ে লেগে যাওয়া আশ্চর্য নয়। এই অবস্থা হলে আমি হোস্টেস বালিকাকে ডেকে পাঠাতাম—তার কাঁধে ভর দিয়ে টুকটুক করে বাথরুমে যেতাম। পোজখানা হতো বিখ্যাত দেশনেতাদের মতো, একটু বুড়ো হলেই যাঁরা সুন্দরী মেয়েদের কাঁধে ভর দিয়ে চলেন। একটা গুঁফো বৃদ্ধের তো আবার ব্রার স্ট্র্যাপ ধরে টেনে দেবার অভ্যাস ছিল।

কুমারকে বললাম, "এসো আমার সঙ্গে।" আমার ওপর ভর করেই ওকে টয়লেটে যেতে হলো। এমন একটা সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করলে!

আবার ওকে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। ওকে ঘুমতে বলে, আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে আছি। জানলা দিয়ে শুধু অন্ধকার। অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই যেন নেই পৃথিবীর। আমার একটু মাল খাবার মেজাজ আসছে। একটা বেঁটে চ্যাপ্টা বোতল হ্যাণ্ডব্যাগের মধ্যে রাখা ছিল। সেইটাই টেনে বার করে, ওষুধের মতো বিনা জলেই খেয়ে ফেললাম।

এইভাবে খাওয়ার একটা মজা আছে। গলা দিয়ে যেতে যেতে একটা কিক মারে—মানে সোজা বাংলায় একখানা তরল লাথি ঝাড়ে। সেইটাই কোঁৎ করে হজম করতে ভারি মজা লাগে।

গলার মধ্যে একটু মাল ঢেলে দিলুম, স্রেফ তরল লাথি খাবার লোভে। আমার ইচ্ছে করছে ক্যাঁত ক্যাঁত করে লাথি খেয়ে মাটিতে পড়ে আমি ছটফট করি, আর আমার দিকে না তাকিয়ে আমাকে আরও লাথি মেরে যাক কেউ।

হাত-ঘড়িটার দিকে একবার নজর দিলাম। টাইম-টেবলে কলকাতার স্থানীয় সময় লেখা রয়েছে। আমার ঘড়িতে এখন জাপানী সময়—কলকাতা থেকে কয়েক ঘণ্টা এগিয়ে রয়েছে। যেন প্লেনটা দেরি করছে। অঙ্ক কষে দেখলাম আমাদের আর কলকাতায় নামতে দেরি নেই। আমরা প্রায় এসে গিয়েছি।

এয়ার হোস্টেস ছুঁড়ীটার ঢং দেখেও বুঝতে পারছি ল্যাণ্ডিং আগত। প্লেন নামবার আগে হোস্টেসরা ঘরসংসার গুছিয়ে ফেলে। তারপর সুট করে বাথরুমে ঢুকে নাকে একটু পাউডার ঘষে নেয়, ঠোঁটে একটু লাঠি-সিঁদুর লাগায়।

সিনিয়র সুন্দরী আমার সামনে দিয়ে ককপিটের দিকে যাচ্ছে।

আমি একটু চোখ মারলাম। শ্রীমতীর সেদিকে নজরই পড়লো না। তা পড়বে কেন বাবা! স্বয়ং কেষ্ট ঠাকুর ডাক পাঠিয়েছেন ককপিট থেকে। ছুঁড়ী সেই যে ঢুকেছে, এখনও বেরোচ্ছে না। এত কি বাবা কাজের কথা আছে! আসলে রস-রসিকতা হচ্ছে! হয়তো কলকাতায় শ্রীমতীর ডিউটি শেষ। তাই ডিউটির বাইরের সময় কাটাবার মতলব চলছে।

আমি হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছি। শ্রীমতী বেরিয়ে এলেই পথরোধ করবো। আমার যে তাকে প্রয়োজন। আমার বুকের মধ্যের নলটা জ্বলছে—আমার একটু জল খাওয়া দরকার।

শ্রীমতী টাট্টু ঘোড়ার মতো টগবগ করে বেরিয়ে এল। খুব চলমান খুশী-খুশী ভাব। জল চাইলাম। জল নিয়ে এল। গ্লাশটা এগিয়ে দিয়ে বললে, "সব প্যাসেঞ্জার ঘুমচ্ছে। তুমি ঘুমলে না?"

বললাম, "পোড়া চোখে ঘুম আসছে না।"

যুবতী আমার হাত থেকে গেলাশটা ফেরত নিতে নিতে বললে, "অনেক দিন পরে দেশে ফিরছো বুঝি? তাতে অনেক সময় উত্তেজনা হয়, ঘুম আসে না।"

আমি ওকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম ক্যাপটেনের ককপিটে কি এত কথা হচ্ছিল। কিন্তু কুমারী বললে, "এবার যাই। নামবার অ্যানাউন্সমেণ্ট করতে হবে। কলকাতায় এখন বৃষ্টি হচ্ছে।"

আমাদের কথার মধ্যেই সীট-বেল্ট বাঁধবার আলোটা জ্বলে উঠলো। একটু পরেই কুমারীর ঘোষণা: "এখন রাত একটা। আমরা কয়েক মিনিটের মধ্যে কলকাতায় অবতরণ করবো। আপনারা সীট-বেল্ট বেঁধে নিন। আপনারা যাঁরা কলকাতায় নেমে যাবেন তাঁরা তাঁদের এম্বার-কেশন কার্ড তৈরি রাখবেন।"

অনুগত কুকুরের মতো কোমরে বক্‌লেশ বেঁধে তৈরি হয়ে নিলাম। অনেকগুলো খুট খুট আওয়াজ এক সঙ্গে প্লেনের মধ্যে শোনা গেল।

অনেকে বেল্ট বেঁধে আবার চোখ বুজলো। এই রাত-দুপুরে যতটা পার ঘুমিয়ে নাও। তাছাড়া ক'টা লোক আর কলকাতায় নামছে? বেশীর ভাগই তো করাচী হয়ে বেরুটে চলে যাবে।

অনেকগুলো বোতলের লাথি খেয়ে আমি একটু ঝিমিয়ে পড়েছি। আমি ছোট্ট জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছি—কখন কলকাতার দর্শন মিলবে। কত লোকের মুখে শুনেছি, আকাশ থেকে কলকাতাকে নাকি খুব ভাল দেখায়। কত পাইলট বলেছে, রাতের কলকাতা ল্যাণ্ডিং-এর সময় একটা স্মরণীয় দৃশ্য। প্রতি রাতেই দেওয়ালি উৎসব চলেছে।

এইবার কিছু কিছু আলো দেখা যাচ্ছে। ঠিক যেন সিনেমা দেখছি। একটা দীর্ঘ ফেড-আউটের পর অন্ধকার পর্দায় ফেড-ইন হচ্ছে—কয়েকটা আলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কুমারকে জাগিয়ে দিতে ইচ্ছে করলো। দেখুক ওর সাধের কলকাতাকে। ওদের শুভদৃষ্টি হোক। কিন্তু বেচারা যদি ঘুমিয়ে পড়ে পায়ের যন্ত্রণা থেকে রেহাই পায়, তাহলে কষ্ট দিয়ে লাভ কী?

কলকাতার আলোগুলো এবার কোটি প্রদীপের মতো দেখাচ্ছে। ওরই মধ্যে কতকগুলো আলো নিশ্চয় রাজবল্লভ সাহা সেকেণ্ড বাই লেনেও জ্বলছে। হাজার হাজার রাজবল্লভ সাহা লেন জোড়া দিয়েই তো এই কলকাতা হয়েছে। দূর থেকে এই ঝাঁকটাকে কলকাতা বলে। নিচে নেমে আর কলকাতাকে খুঁজে পাই না। তখন হয় বাগবাজার, না হয় শ্যামবাজার, না হয় শ্যামপুকুর, না হয় নোনাপুকুর, না হয় বাজেশিবপুর, না হয় কাশুন্দে। হয়তো কুমার এই সব পুকুর, বাজার আর পুর যোগ দিয়ে অঙ্ক কষে কলকাতাকে খুজে বার করতে পারবে। ওসব বাবা, আমার কম্মো নয়।

আমার এখন অন্য চিন্তা। একটু গুছিয়ে বসতে হবে। তারপর মার্কিন মুলুকে যে অভ্যাসটা পাকিয়ে এসেছি সেই ইন্দ্রিয়সুখের সন্ধান

করতে হবে। এখানে শালা আবার স্পোর্টিং স্পিরিট নেই। এখানে সবই পাবে—কিন্তু পয়সা ফেললে। পয়সার বদলে তোমাকে ইন্দ্রিয়সুখ দেবার জন্যে হাজার হাজার মেয়ে আইনকে কলা দেখিয়ে, পুলিসকে ডোণ্ট-কেয়ার করে বসে আছে। বড্ড বেশী ধর্মের জায়গা কিনা—তাই পয়সা ছাড়া এখানে কেউ কিছু জানে না। পয়সা না দিলে তুমি মন্দিরে মায়ের কাছে যেতে পারবে না! পয়সা থাকলে সুন্দরী কন্যার বাপেরা তোমার বাপের পায়ের কাছে মেয়ের ফটো নিয়ে লুটিয়ে পড়বে। পয়সা থাকলে সিনেমার পোস্টারে তোমার নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওপরে উঠবে। দুনিয়ার সমস্ত এক নম্বর মাল তুমি এই ইণ্ডিয়াতে, ভগবানের এই খাসমহলে, পয়সা থাকলেই পেয়ে যাবে।

আমার বেশ লাগছে। এরোড্রোমে এখন কয়েক ডজন লোক নিশ্চয় এই প্লেনের যাত্রীদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে অপেক্ষা করছে। আর একটু পরেই যেমনি বোয়িং ৭০৭ দমদমের মাটি স্পর্শ করবে, কত নাটকের অভিনয় হবে। নিমাই মুখুজ্যে টুলটুলের বাবা-মা'র কাছে দাঁড়িয়ে কত খেলা দেখাবে। ইন্দ্রাণী সেনও স্বামীর সামনে কত অভিনয় করবে। আর আমি শালা খিলখিল করে হাসবো। ভালই হয়েছে হুইস্কির মাত্রাটা বেশী হয়ে গিয়েছে। না হলে সুস্থ শরীরে এই সব কীর্তি দেখলে সত্যি সত্যিই মাথাটা খারাপ হয়ে যেতো। এই সব মজা দেখে, তারপর নিজের খেলা নিয়ে ব্যস্ত হতে হবে। ইণ্ডিয়ার লোকগুলোকে তো বুঝতে দিলে চলবে না, অনির্বাণ চাটুজ্যে হুড়কো খেয়ে মার্কিন মুলুক থেকে পালিয়ে এসেছে।

আমাকে আবার কোনো ধান্দা দেখতে হবে। দেখতে দেখতে কতকগুলো বছর গেল। আর ক'টা বছর পরেই তো চোখে ছানি পড়বে, রক্ত ও পেচ্ছাপ মধুময় হয়ে উঠবে, প্রসট্রেট গ্রন্থি আকারে বেড়ে যাবে, রক্তের চাপ তালগাছের মাথায় উঠে বসে থাকবে, ইন্দ্রিয়গুলো মাড়ওয়ারি কোম্পানির তৈরি গাড়ির মতো ঝড়ঝড় করবে, শুধু ভোগাবে,

কোনো কাজে লাগবে না। তার আগেই বাপু একটু উপভোগের মাইলেজটা বাড়িয়ে নিতে হবে—না হলে বুড়ো বয়সে আফসোসের অবধি থাকবে না।

কুমার এবার পাশ ফিরল। তারপর চোখ মেলে তাকাল। "মাস্টারমশায়, কী ভাবছেন?" জিজ্ঞেস করলে কুমার।

সে-সব কথা তুমি বুঝবে না ভাই। তোমার সামনে এখন অন্য স্বপ্ন। তোমাকে যে অনেক কষ্ট পেতে হবে।

আমি চুপচাপ রয়েছি দেখে কুমার বললে, "প্রচণ্ড একটা উত্তেজনা বোধ করছি। আর কয়েক মুহূর্ত পরেই ভারতবর্ষের মাটিতে পা দেবো —যেখানে আমার বাবা জন্মেছিলেন। জানেন মাস্টারমশায়, বাবা-মাকে এয়ারপোর্ট থেকেই একটা চিঠি লিখবো।"

"খুব ভাল কথা।"

"আপনার কথাও লিখবো। আপনি তো সমস্ত পথ দেখাশোনা করে নিয়ে এলেন।"

আমার মনে পড়ে গেল, আমার বুক-পকেটে এখনও আইলীনের চিরকুটটা রয়েছে—কুমারকে একটু দেখো। বললাম, "লিখে দিও তোমার বাবা-মাকে, আমার সামান্য যা কর্তব্য তা করেছি। কিন্তু তোমার বাবা তার থেকে অনেক বেশী করছেন তাঁর জন্মভূমির জন্যে।"

প্লেনটা এবার চিলের মতো শূন্যে পাক খাচ্ছে। এই পাক খাওয়া মানেই ঘুরে ঘুরে রানওয়ের মুখটা খুঁজে বার করে নেওয়া। তারপরেই তো হাওয়া-ভরা রবারের চাকাগুলো প্রচণ্ড গতিতে টারম্যাক-দেওয়া রানওয়েকে চুম্বন করবে। দীর্ঘ বিরহের পর উত্তপ্ত আলিঙ্গন। তারপর স্থির হবে বিহঙ্গ। এবং আমাদের অবতরণ।

আমি বললাম, "কুমার, তোমার পায়ের অবস্থা কীরকম?"

কিন্তু ওর উত্তর শুনতে পেলাম না। অকস্মাৎ একটা প্রচণ্ড কানফাটা শব্দ। মনে হলো শব্দের করাত দিয়েই আমাদের টুকরো টুকরো করে

কেটে ফেলবে। ধাকাটাও যে কী ভয়াবহ তা সেফটি-বেল্ট না থাকলে আরও ভালভাবে বুঝতে পারতাম। পেটের কাছে অসহ্য যন্ত্রণায় সমস্ত শরীরটা দুমড়ে যাবে মনে হলো। কয়েক মিনিট বোধ হয় সংবিৎ হারিয়ে ফেলেছিলাম। তারপর শুনলাম—'আগুন, আগুন।'

পুরুষ, নারী, শিশু-কণ্ঠে 'আগুন আগুন' শব্দটাও ছড়িয়ে পড়েছে।

ক্যাপটেন ককপিট থেকে চিৎকার করছেন—আমরা ঘন অন্ধকারে দুর্যোগে রানওয়ে ভুল করে অন্য কোথাও নেমে পড়েছি। আপনারা এমার্জেন্সি দরজাগুলো খুলে তাড়াতাড়ি বাইরে লাফিয়ে পড়ুন।

ভিতরে ভক ভক করে ধোঁয়া ঢুকছে। বাইরে এবং ভিতরে করুণ আর্তনাদ ভরে উঠছে। আলোগুলো সব নিভে গিয়েছে। টর্চ জেলে দু-চারজন লাথি মেরে এমার্জেন্সি দরজা খুলে ফেললে। বাইরের অন্ধকারে যাত্রীরা প্রাণভয়ে টপাটপ লাফিয়ে পড়ছে।

সেফটি-বেল্টটা খুলে ফেলে আমিও অন্ধকারে পথ হাতড়াতে হাতড়াতে এগিয়ে যাচ্ছি। আমার কিন্তু মাইরি কেমন হাসি লাগছে। অন্ধকারে একটা ভোঁদামার্কা লোক ধড়ফড় করতে করতে বাংলায় বলছে, আমাকে একটু পথ ছেড়ে দিন—প্লিজ। নিমাই মুখুজ্যের গলা। জবাই-এর আগে পাঁঠার মত কাঁপছে নিমাই মুখুজ্যে। দরজার মুখে গিয়ে লাফ দিতে ভয় পাচ্ছে। আমার কী খেয়াল চাপল, ওঁর পশ্চাতে একটা আলতো লাথি ঝাড়লাম। আমারও আনন্দ হলো, নিমাই মুখুজ্যেও প্রাণে বেঁচে গেল। আরও অনেকে টপাটপ লাফিয়ে পড়ছে।

নারীকণ্ঠের আর্তনাদে, শিশুর কান্নায় কেমন এক ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। তবু মনে হচ্ছে ব্যাপারটা যেন ইংরিজী কোনো সিনেমার সুটিং-এর দৃশ্য। প্রতি মুহূর্তে লোক লাফিয়ে পড়ছে। নিচু থেকেও আর্তনাদ ভেসে আসছে।

আর ধোঁয়াটা ক্রমশঃ যেন আরও গাঢ় হয়ে উঠে আমার সমস্ত ফুসফুসটা ঘিরে ধরবার চেষ্টা করছে। বাঁচবার আগ্রহটা আমার সেই

অনুপাতে যেন বাড়ছে। আমাকে লাফিয়ে পড়তেই হবে। আমি লাফ দেবো বলে ঠিক করেছি।

বিপদ দেখছি একা আসে না। নিজে কী করে জান বাঁচাবো ভাবছি, ঠিক এই সময় মনে হচ্ছে বুকপকেটের মধ্যে একটা কাঁকড়া বিছে ঢুকে পড়েছে। ওইখানে সড়সড় করছে। শালা বিছে আর সময় পেলে না। এই দুর্যোগে, এই সময় আমাকে জ্বালাতে শুরু করলে!

এয়ার হোস্টেস ছুঁড়ীটা তখনও দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ডিউটি করছে। লোককে নিচে লাফিয়ে পড়তে সাহায্য করছে। আমাকে দেখেই বললে, "ইয়ংম্যান, ভয় কী? লাফিয়ে পড়ো। আগুন ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। যে কোনো মুহূর্তে সমস্ত প্লেনটা ফেটে যাতে পারে।"

"আমার পকেটে যে বিছে ঢুকেছে। বিষাক্ত কাঁকড়া বিছে।"

ছুঁড়ী আমার কথা বুঝতে পারলে না। বললে, "কাম্ অন্। মাটিতে নেমে বিছে বার করো", এই বলে নিজেই সে লাফ মারলে।

আমার মাথা ঘুরছে। তিলে বিচ্ছু অনির্বাণ চাটুজ্যের পকেটেই ব্যাটাচ্ছেলে বিছে ঢুকলো। পকেটে তো বিছে ছিল না—শুধু বেণীমাধবের স্ত্রী আইলীনের চিরকুটটা ছিল: "কুমার ভারতবর্ষে যাচ্ছে—ওর বাবার ইচ্ছে নয়, আর দেরী হয়। ওকে পথে দেখো।"

আমার মাথা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আমি চোখের সামনে বেণীমাধব, আইলীন, ইউমোফপুলাস, বেণীমাধবের মৃত্যুপথযাত্রী মা সকলকে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু কুমার নেই। কোথায় কুমার? মনে পড়ে গেল তার তো পায়ে ব্যথা। আমার দোষেই তো হংকং-এ জখম হয়েছে ওর পা-টা। ও তো বেরোতে পারেনি।

আমি গুণ্ডা, বদমাস টাইপের ছোঁড়া। দুনিয়ার কাউকে ভয় পাই না। সাপ, বাঘকেও তোয়াক্কা করি না। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই বিছেতে বড্ড ভয় আমার। বাচ্চাবেলায় আমাকে যে একবার বিছে

কামড় দিয়েছিল। তারপর থেকে খুব অবাধ্য হলে বাবা বলতেন, 'দাঁড়া, বিছেকে ডাকছি।

আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। আমার দেহটা সামনের দিকে গিয়ে বাইরে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে। আর বিছেটা পিছনে যেতে বলছে। একটু এগোলেই কামড়াবে। বিছের কামড়ে যে কী যন্ত্রণা আমার এখনও মনে আছে।

বিছেটার ভয়ে আমাকে আবার ফিরতে হচ্ছে। অন্ধকার আর বিষাক্ত ধোঁয়া কাটিয়ে আমি আমার সিটের কাছে ফিরে যাচ্ছি।

আমার চোখ, আমার সমস্ত দেহ জ্বলছে। আমি অন্ধকারে হাতড়াচ্ছি—কুমার কোথায়? কুমার কী লাফিয়ে পড়েছে? কী করে পালাবে কুমার? ওই তো এক কোণে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে বেণীমাধব ও আইলীনের সাধের ইণ্ডি।

আমি শালা একি বিপদে পড়লাম! আমার বুকপকেটে মস্ত একটা বিছে সড়সড় করছে। আমি টঁ্যা-ফুঁ করলেই কামড়ে দেবে। অথচ দেখুন আমার বাঁচবার ইচ্ছে আছে। কিন্তু বিছেটা আমাকে ভয় দেখাচ্ছে। ভারতবর্ষের জন্যে আমাকেও কিছু করতে বলছে।

তার থেকে বাপু আমি কুমারকেই টেনে নিয়ে আসি। মেয়েমানুষদের সান্নিধ্যে শরীরের ওপর অনেক অত্যাচার করলেও আমার দেহে এখনও কিছু জোর আছে।

আমার মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে—দেড়শ সাঁওতালী মিতা মাথার ভিতর ছাত পেটাচ্ছে। আমি যেন একটা জ্বলন্ত ফারনেসের মধ্যে ঢুকে পড়ছি স্বেচ্ছায়। আমি কুমারের অর্ধচেতন দেহখানা টেনে তুলে নিয়েছি। ওকে টানতে টানতে এমার্জেন্সি দরজার দিকে যাবার চেষ্টা করছি।

কুমার বলছে, "মাস্টারমশায়", আপনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে পালান; না হলে আপনিও বিপদে পড়ে যাবেন।"

কিন্তু আমার বুকপকেটের বিছেটা তখনও আমাকে আলতো খোঁচা দিচ্ছে—আমি একটু বেগড়বাই করলেই আমাকে কামড়াবে—আমি মত্ত অবস্থাতেও বুঝতে পারছি। বিছেটা বলছে, "তোমার বাবার কথা মনে নেই? হারাণচন্দ্রের ছেলে না তুমি?"

আমার মুখ দিয়ে বিছেটা বলিয়ে নিলে, "কুমার, তোমাকে আমার থেকে অনেক বেশী প্রয়োজন ইণ্ডিয়ার।"

আগুনটা আরও ছড়িয়ে পড়েছে। হাঁপাতে হাঁপাতে আমি দরজার খুব কাছে এসে পড়েছি। এবার খুব আনন্দ হচ্ছে। বিছেটাও আনন্দে বুকপকেটে লাফাচ্ছে। আমি যেন অন্ধকার থেকে আলোকের পথ খুঁজতে বেরিয়ে ব্যর্থ হয়ে নিজেকেই মশাল করে নিয়েছি।

কুমার কী সব বকছে! আমি শুনতে পাচ্ছি না। আমি ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। আমি কুমারকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। আমার বুকপকেটের বিছেটা সঙ্গে সঙ্গে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমার চারদিকে আগুন। আমি এখনও বাঁচতে চাই, কিন্তু পথ খুঁজে পাচ্ছি না—হুড়মুড় করে আমার দেহের ওপর ছাদটা খসে পড়ে পথ বন্ধ করে দিয়েছে। আমি হঠাৎ বাবার মুখ দেখতে পাচ্ছি।

লেলিহান আগুনের শিখা হারাণচন্দ্রের সন্তান অনির্বাণকে ঘিরে ধরেছে। দেহের অব্যক্ত যন্ত্রণার মধ্যে হঠাৎ যেন আমার বোধোদয় হচ্ছে—দূরে দাঁড়িয়ে আমার বাবা ও মা যেন দেখছেন তাঁদের অনির্বাণ দীপশিখায় পরিবর্তিত হচ্ছে।

দৈনিক পত্র থেকে

দমদমের নিকট ধ্বংসপ্রাপ্ত বোয়িং বিমানের একশ জন যাত্রী দৈবক্রমে রক্ষা পেয়েছেন। এই প্লেনের অন্যতম যাত্রী মার্কিন সমাজসেবী কুমার রায় আমাকে বলেন—আমার জীবন রক্ষা করতে গিয়েই সহযাত্রী অনির্বাণ চাটার্জি প্রাণ হারিয়েছেন! এই প্লেনের অপর যাত্রী অধ্যাপক নিমাই মুখার্জির কাছে অবশ্য জানা যায়, শ্রীচাটার্জি দুর্ঘটনাকালে মদ্যপানে সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন।